জানুয়ারি ২০১৯ ❑ পৌষ-মাঘ ১৪২৫

# নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

*লাবীব মাহবুব, ষষ্ঠ শ্রেণি, মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা*

*দীপান্বিতা বড়ুয়া তৃশা, সপ্তম শ্রেণি, এসএই, বিএফএ*

# সম্পাদকীয়

সবার জন্য রইল ইংরেজি নতুন বছর ২০১৯-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই বছরে তুমি কী হতে চাও? সুপার হিরো?

নবারুণ জানতে চেয়েছিল, তুমি কাকে সুপার হিরো মনে করো? কেন করো? তোমরা জানিয়েছ তোমাদের ভাবনার কথা। এক বন্ধু লিখেছ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তোমার সুপার হিরো। এই জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখে বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দেওয়া এই মহান নেতা ফিরে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে। রক্তাক্ত স্বদেশ বুকে টেনে নিয়েছিল এই মহান নেতাকে।

অন্যকে সাহায্য করাই যে সুপার হিরো হয়ে ওঠার আসল মন্ত্র, তা তোমাদের কথা থেকেই বুঝতে পারছি। আসলেই তাই। সুপারম্যান-ব্যাটম্যান-স্পাইডার ম্যানদেরও কিন্তু এই একই কাজ। অন্যকে সাহায্য করা। কেবল মানুষ নয়, জীবজন্তু-প্রকৃতির সবাইকে সাহায্য করে তুমিও হয়ে ওঠ সুপার হিরো।

নতুন বই নিয়ে শুরু করেছ নতুন ক্লাস, তাই না? আমাদের দেশটাও নতুন বইয়ের মতো নতুন সরকারের হাত ধরে শুরু করেছে নতুন পথ চলা। শুভ হোক সকলের, সব কিছুর।

# সূচি

## নিবন্ধ


২ নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৩ তোমরাই সুপার হিরো আজ এবং আগামীরও! ইমরুল ইউসুফ
৯ স্ট্যান লি: সুপার হিরোদের সুপার হিরো/রূপন্তী রায়
১১ আগামী দিনের সুপার হিরো / শামস নূর
১৬ সারা বিশ্বের 'বাঙালি' সুপার হিরো/আসমা আক্তার
১৭ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
১৭ আমার সুপার হিরো: আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এইচ. এম. সা'আদ
১৮ আমার সুপার হিরো উড়তে শেখায়/সামিহা তাসনিম সিনহা
১৯ আমার প্রকৃত সুপার হিরো/রুকাইয়া তাবাস্‌সুম রুপু
২০ বীরপ্রতিক খেতাব পাওয়া ছোট্ট মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী গল্প আশিক মুস্তাফা
২৪ সীমা সরকার: একজন সুপার হিরো/ বিনয় দত্ত
২৬ আমার সুপার হিরো 'বুবু'/রেজানুল হক রাফি
২৬ সুপার হিরো 'দাদা'/ইসরাত ফারাবী
২৭ একজন সুপার হিরো আমার বন্ধু/তাওফিক রায়হান
২৮ সুপার হিরো 'বাংলাদেশ'/শাহানা আফরোজ
৩৩ নতুন বইয়ের গন্ধ/মাহমুদউল্লাহ
৩৬ সুপারবাগ/অনিক শুভ
৪৫ রহস্যময় স্থাপত্য/খালিদ বিন আনিস
৫০ মানুষ হতে চাই/মীম নোশিন নাওয়াল খান
৫৪ কন্যা সুপার হিরো/জান্নাতে রোজী
৫৫ সম্ভাবনাময় পেশা অকুপেশনাল থেরাপি রাবেয়া ফেরদৌস
৫৬ আমরা করব মঙ্গল জয়/রেজা নওফল হায়দার
৬২ মানুষ এখানে কথা কয় শিস্ দিয়ে/মেজবাউল হক
৬৩ শীতে শরীর চাঙা রাখে যে খাবার/মো. জামাল উদ্দিন
৬৪ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ


প্রচ্ছদের ব্যবহৃত ছবির মডেল: আয়ান হক, মাইনুল ইসলাম, খাদিজাতুল খুবরা, ইরান ইনায়া


**প্রধান সম্পাদক:** মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন **সিনিয়র সম্পাদক:** মোঃ এনামুল কবীর **সম্পাদক:** নাসরীন জাহান লিপি
**সহ-সম্পাদক:** শাহানা আফরোজ, মো. জামাল উদ্দিন
**সম্পাদকীয় সহযোগী:** তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা, মেজবাউল হক, সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
**সহযোগী শিল্পনির্দেশক:** সুবর্ণা শীল **অলংকরণ:** নাহ্‌রীন সুলতানা **ফটোগ্রাফার:** মো. নাজিম উদ্দিন

**যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা,** চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
**ফোন :** ৯৩৩১১৮৫, **E-mail :** editornobarun@dfp.gov.bd, **ওয়েবসাইট:** www.dfp.gov.bd

**বিক্রয় ও বিতরণ: সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০, **মূল্য:** ২০.০০ টাকা। **মুদ্রণ :** মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

ডিসেম্বরে নবারুণের জন্মদিন উপলক্ষে ছবি এঁকেছে বন্ধু-
***মু. আহনাফ সিদ্দিক***
***চতুর্থ শ্রেণি, গলাচিপা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়***

## কবিতা


২৩ সাদাত শায়েব
২৯ নাসির আহমেদ/সানজানা আহমেদ
৩০ মাসুমা রুমা/ জাহাঙ্গীর আলম জাহান/দুখু বাঙাল
৩১ জসীম মেহবুব/গোলাম নবী পান্না
৩২ আজিম হোসেন/ শাহরুবা চৌধুরী/মীর জামাল উদ্দিন
৪৬ মেহেদা আক্তার মামণি/ আবির হোসেন
৪৭ মাকিদ হায়দার/ সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী
আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক
৬১ হাসানাত লোকমান


## গল্প


৩৮ বুনডি/কাজী কেয়া
৪২ নেপাল সাধু ও জলদেবতা/দিলারা মেসবাহ
৪৮ একদিন এক কাজল/আহমেদ রিয়াজ
৫৩ চালাক গাধা/ আলম তালুকদার


## আঁকা ছবি


২য় প্রচ্ছদ: লাবীব মাহবুব, দীপান্বিতা বড়ুয়া তৃশা
শেষ প্রচ্ছদ: তাজনিন দেলওয়ার খান
০৩ পাতা অংরূপীনি
০৪ আবদুল্লাহ মারজুক
২৬ তাহসিনা তাবাসসুম জুহানা
২৯ তানজিদ নূর রাফি
৩০ আয়ান হক ভূঁইয়া
৩১ দ্বীপাঞ্জলি বড়ুয়া তন্নি
৩২ কাজী নাফিসা তাবাসসুম
৩৪ তাসনিম মাহদী
৪১ মুবাশশির আহমেদ কাদির
৪৭ শ্রেয়সী শংকর কুন্ডু
৪৮ আজমেরী সুলতানা
৬১ লিলিয়ান ত্রিপুরা


# নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর

### সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ইংরেজি নববর্ষের অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল বন্ধু তোমাদের জন্য। নতুন বছর যেন তোমাদের জীবনে নতুন প্রত্যাশা, নতুন উদ্যম, নির্মল আনন্দ, সুস্বাস্থ্য, খুশি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এই কামনা রইল। বন্ধুরা, ২৪শে ডিসেম্বর ২০১৮ সকালে গণভবনে শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচির সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৯ সালের প্রথম দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎসবের মধ্য দিয়ে চার কোটি ২৬ লাখ ১৯ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২ টি বই বিতরণ করা হয়। এরই মধ্যে তোমরাও পেয়েছ নতুন বই। নতুন বই হাতে মেতে থাকো, আর লিখো, আঁকো নবারুণের জন্য।

### ফেসবুক মতামত

**রাহান তাপস :** ছেলেবেলায় জাদুকে সত্যি মনে হতো। মনে হতো মন্ত্রের কারণে সব হতো। খুব অবাক লাগত।

**নবারুণ :** সত্যিই তাই। আমরাও এক সময় তাই ভাবতাম। আসলে জাদুতে মন্ত্রের কোনো হাত নেই, সব হাতের কারসাজি।

**মজনু মিয়া:** জাদুর উপর কি কবিতা-ছড়া-গল্প নেওয়া হবে শ্রদ্ধেয়?

**নবারুণ :** যাবে। মনোনীত হলে ছাপা হবে।

**আরিফ আনজুম :** জাদু বিষয়ক শিশুতোষ গল্প পাঠানো যাবে কী?

**নবারুণ :** হবে। মনোনীত হলে ছাপা হবে।

**এসএম শাহজাহান সিরাজ :** লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে কোন ফন্ট ব্যবহার করতে হবে?

**নবারুণ :** সুতন্নী হলে ভালো হয়।

# তোমরাই সুপার হিরো আজ এবং আগামীরও!

ইমরুল ইউসুফ

*পাতা অংরূপীনি, শ্রেণি- মঞ্জুরী, নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা*

**আমরা শক্তি আমরা বল**

সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। রাস্তায় নেমে এসেছে হাজার হাজার শিশু-কিশোর, খুদে পড়ুয়া। পরনে স্কুল-কলেজের ইউনিফর্ম। পিঠে স্কুল ব্যাগ। বিশাল আকাশ যেন নেমে এসেছে শহরে। রাস্তা জুড়ে শুধু নীল আর নীল। সেইসঙ্গে সাদার মিশ্রণ। নীল আকাশে সাদা মেঘ যেভাবে ছুটে বেড়ায়, শিশু-কিশোর-কিশোরীরাও সেভাবেই ছুটছে। লক্ষ্য একটাই। সড়ক হতে হবে নিরাপদ। তারা সুশৃঙ্খলভাবে গাড়ি চলাচলে সহায়তা করছে। আলাদা লেন করে দিচ্ছে রিক্সার, মোটর বাইকের।

সাধারণ মানুষকে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পার হতে সহায়তা করছে। বয়স্ক নারী-পুরুষ-শিশুদের হাত ধরে পার করে দিচ্ছে রাস্তা। সাবার চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাস। সব অন্যায় রুখে দেওয়ার প্রত্যয়। সবাই নির্ভয়, নির্ভার, ক্লান্তিহীন। ছুটছে গাড়ির চাকার মতো। নদীর স্রোতের মতো। কারণ তাদের মনে আছে শক্তি। বুকে আছে বল। মনে শক্তি, বুকে বল, আত্মবিশ্বাস থাকলেই তো যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়। এই যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধ অসততার বিরুদ্ধে।

এই যুদ্ধ হিংসা, লোভ, দুর্নীতি, অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে। এসব যুদ্ধে যারা জয়ী হয় বা বিজয় ছিনিয়ে আনে তারাই সফল মানুষ। যারা অন্যের বিপদে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, খারাপ কিছু ঘটতে দেখলে রুখে দাঁড়ায় তারাই তো বীর। ঢাকার রাজপথে নেমে আসা অসীম সাহসী সেসব কিশোর-কিশোরীরাও একেকজন বীর। ইতিহাসের নতুন কাণ্ডারি। কারণ তারা বারবার বলেছে–

*‘যদি তুমি ভয় পাও, তবে তুমি হবে শেষ*
*যদি তুমি রুখে দাঁড়াও, তুমি বাংলাদেশ।’*

সত্যিই তো নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে জেগে ওঠা সেইসব কিশোর-তরুণরা কাউকে ভয় পায়নি। তারা দেখিয়েছে আমি, তুমি, আমরা যখন রুখে দাঁড়াই তখন আমরাই বাংলাদেশ।

## বীর বা হিরো কারা

বীর অর্থ নির্ভীক ও বলবান, তেজস্বী। শক্তিমান পুরুষ। 'বীর' শব্দটি এমনই যে, শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে এক ধরনের আত্ম-উপলব্ধি, আত্মশক্তি, আত্মজয়, আত্ম-স্বীকৃতি, আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাসের জন্ম হয়। এই বিশ্বাস, মনের এই শক্তি আমাদের কাজকে অনেকটা সহজ করে দেয়। নতুন কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই বীরত্ব হচ্ছে আলো। বীরত্ব হচ্ছে ভালো। বীরত্ব হচ্ছে মানবীয় শক্তি। মানবীয় গুণ।

বীর এমনই একজন ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি যিনি অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী। যারা বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদকে পাশ কাটিয়ে, ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে সাহসিকতার সঙ্গে মানবজাতির জন্য কাজ করে সফল হন। তাঁর অসামান্য কর্মকাণ্ডের ফলে দেশ, জাতি হয়ে ওঠে আলোকিত, কল্যাণকর। তিনি বিপুল শক্তিমত্তা, দুঃসাহসিক কার্যাবলী, বুদ্ধি-কৌশলে যুদ্ধ জয় করে নিজের সুনাম বৃদ্ধিসহ জাতীয় বীরে পরিণত হন। আর নারীদের ক্ষেত্রে যিনি এ ধরনের বীরত্বপূর্ণ কর্মের অধিকারী হন, তাঁকে আমরা বলি বীরঙ্গনা।

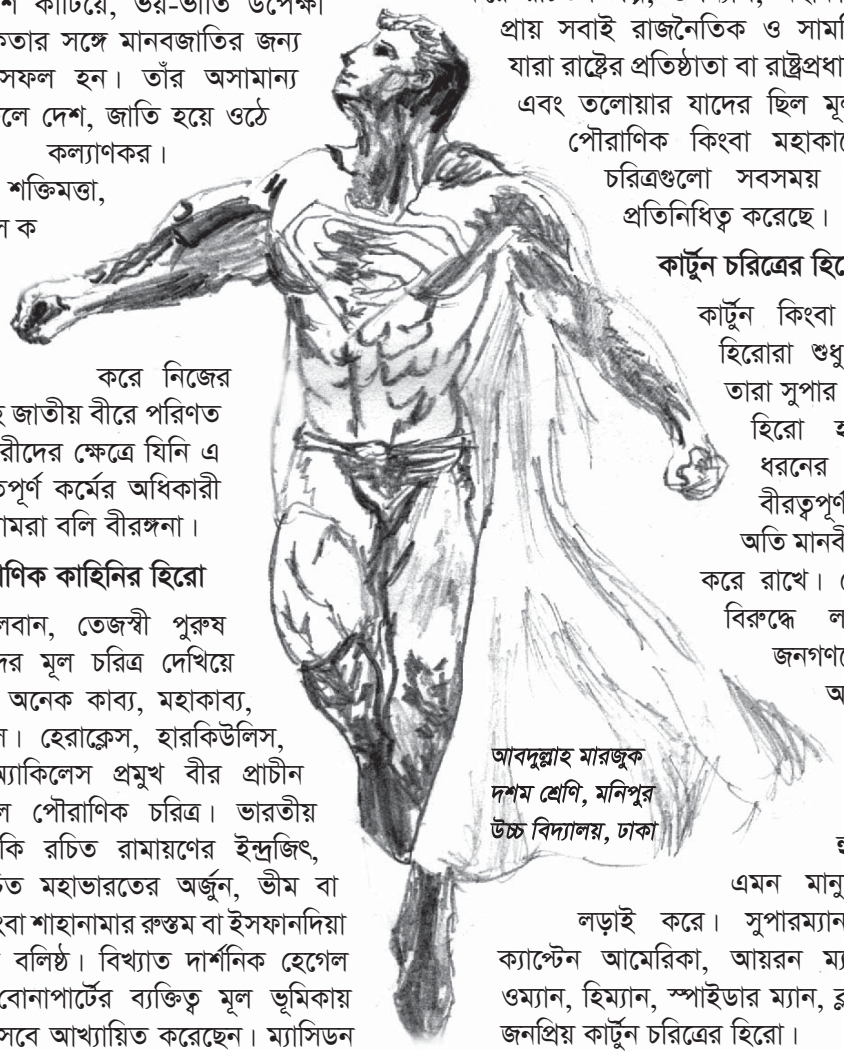

*আবদুল্লাহ মারজুক*
*দশম শ্রেণি, মনিপুর*
*উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা*

## মিথ বা পৌরাণিক কাহিনির হিরো

শক্তিমান, বলবান, তেজস্বী পুরুষ কিংবা নারীদের মূল চরিত্র দেখিয়ে লেখা হয়েছে অনেক কাব্য, মহাকাব্য, গল্প, উপন্যাস। হেরাক্লেস, হারকিউলিস, পার্সেসাস, অ্যাকিলেস প্রমুখ বীর প্রাচীন গ্রিসের উজ্জ্বল পৌরাণিক চরিত্র। ভারতীয় পুরাণে বাল্মীকি রচিত রামায়ণের ইন্দ্রজিৎ, বেদব্যাস রচিত মহাভারতের অর্জুন, ভীম বা দ্রোণাচার্য, কিংবা শাহানামার রুস্তম বা ইসফানদিয়া নিজ বাহুবলে বলিষ্ঠ। বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ব্যক্তিত্ব মূল ভূমিকায় এনে বীর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ম্যাসিডন নামক প্রাচীন গ্রিক রাজা আলেকজান্ডার মহাবীর হিসেবে জগৎ বিখ্যাত। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় কাল্পনিক চরিত্র রবিনহুড ডাকাতি করতেন ধনীদের ঘরে। কিন্তু তা নিজে ভোগ করতেন না। বিলিয়ে দিতেন গরিবদের মধ্যে। দেশের গরিব এবং অসহায় মানুষের কাছে রবিনহুড ছিলেন দেবতা। যুবকদের কাছে ছিলেন আশার প্রদীপ এক বীর যোদ্ধা। যিনি সবসময় অন্যায়, জুলুম আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। ডাকাত রত্নাকরও ছিলেন সেই অর্থে বীর।

১৮৪১ সালে থমাস কার্লাইলের *অন হিরোজ, হিরো ওরশিপ অ্যান্ড দ্য হিরোইক ইন হিস্ট্রি* শিরোনামের বই বীর ও মহৎ ব্যক্তিদের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে উপজীব্য করে রচিত। গল্প, উপন্যাস, মহাকাব্যের বীরেরা প্রায় সবাই রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্ব, যারা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বা রাষ্ট্রপ্রধান। অস্ত্র, ঢাল এবং তলোয়ার যাদের ছিল মূল উপজীব্য। পৌরাণিক কিংবা মহাকাব্যের ওইসব চরিত্রগুলো সবসময় হিরোইজমের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

## কার্টুন চরিত্রের হিরো

কার্টুন কিংবা কল্পকাহিনির হিরোরা শুধু হিরো নয়। তারা সুপার হিরো। সুপার হিরো হচ্ছে বিশেষ ধরনের পোশাক পরা বীরত্বপূর্ণ চরিত্র। যে অতি মানবীয় শক্তি ধারণ করে রাখে। যে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করে। জনগণকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। মানুষের জন্য হুমকিস্বরূপ এমন মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সুপারম্যান, ব্যাটম্যান, ক্যাপ্টেন আমেরিকা, আয়রন ম্যান, ওয়ান্ডার ওম্যান, হিম্যান, স্পাইডার ম্যান, ব্লাকহুড প্রভৃতি জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্রের হিরো।

## এ সময়ের হিরো

যারা বলবান, তেজস্বী, কৌশলী যোদ্ধা, অস্ত্র এবং ঘোড়া চালানোয় পারদর্শী আগে তারাই ছিল বীর। কিন্তু এখন বীরের অর্থ এবং ভাব পালটেছে। এ যুগে বীর বলতে তাকে বুঝানো হয় যিনি অস্ত্র, ঢাল, তলোয়ার ছাড়াই অসম্ভব সাহসিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাজ করেন। একজন অগ্নিনির্বাপক কর্মী যখন কোনো শিশু বা বৃদ্ধের জীবন বাঁচায় তখন তাকে বীরের পর্যায়ে ফেলা হয়। একজন কিশোর বা কিশোরী যখন পুকুর বা নদীতে ডুবতে বসা কাউকে নিজের জীবন বাজি রেখে বাঁচায় তখন সে মুহূর্তেই হিরো হয়ে যায়। লাল শার্ট কিংবা মাফলার উড়িয়ে যে শিশুরা ট্রেনকে ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচায় সেই তো হিরো। যে শিক্ষার্থী পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো গান গেয়ে, নেচে, এঁকে, লিখে, অভিনয় করে, ফটোগ্রাফি করে কিংবা নতুন কোনো কিছু আবিষ্কারে মানুষকে চমকে দেয় সে-ই আমাদের কাছে হিরো।

আমরা এখন তাদের হিরো বলি যারা অসুস্থ মানুষকে রক্ত দেয় বা রক্তযোদ্ধা। যে পরিচ্ছন্নকর্মী শহর নগর পরিষ্কার রাখে। আমাদের কাছে সে-ই হিরো যে 'ভাষা হোক উন্মুক্ত' এই স্লোগানকে সামনে রেখে অভ্র নামের বাংলা ফন্ট আবিষ্কার করে। এখন বীর, যে কৃষক নতুন নতুন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে শস্য শাকসবজি উৎপাদন করে। মৎস চাষ করে। রোবট, ড্রোন, জাহাজ, গাড়ি কিংবা সফটওয়্যার বানায়। একজন ক্রীড়াবিদ যিনি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। জয় করেন স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা ব্রোঞ্জ পদক। তখন তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশ ও জাতির মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় বীরে পরিণত হন। যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বে নিজের দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন বা করার জন্য কাজ করছেন। যারা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। যারা মন্দকে সরিয়ে ভালোর উপাসনা করেন। যারা ভালোকে ছড়িয়ে দেন সবার মাঝে তারাই আমাদের কাছে সত্যিকারের বীর বা হিরো। তার মানে–

'বীর বা হিরো কারা
কাজে সফল যারা।'

এজন্য হিরো হতে বয়স লাগে না। যে-কোনো বয়সেই একজন মানুষ হিরো হতে পারে। শুধু প্রয়োজন উদ্যোগ, উদ্যম, সাহস, অধ্যবসায়, বুদ্ধি এবং পরিশ্রম করার মানসিকতা।

## আমরা সবাই রাজা

অনেকেরই ছোটোবেলা কেটেছে সুর করে করে 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' গাইতে গাইতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চিন্তা বা ভাব থেকেই গানটি লেখেন না কেন, এই গান শুনে ভাবতাম আমিই তো রাজা। আমি বীর। আমিও যুদ্ধ করতে পারি। যুদ্ধের ময়দানে বীরদর্পে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতা 'মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে/মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে/তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে/দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে/ আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে/টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে/...এমন সময় হারে রে রে রে রে/ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে/তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে/ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে/বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে/পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো/ আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে/'আমি আছি, ভয় কেন মা কর'

পড়তাম আর ভাবতাম আমিও তো বীরপুরুষ। মায়ের পালকির পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে মাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। পথে ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। মাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাচ্ছি। কিংবা যখন পড়ি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা–

'বল বীর/বল উন্নত মম শির!/শির নেহারী আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রী! / বল বীর/ বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি/চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি/ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া/ খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,/উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাতৃর!/ মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজ টীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!/বল বীর/আমি চির-উন্নত শির!'

তখন মনের মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি, বিদ্রোহের জন্ম হতো। মনে হতো সত্যিই তো আমি বিদ্রোহী। আমি বীর। আমি সবকিছু করতে পারি। শত বাধা ডিঙাতে পারি। শত কষ্ট সইতে পারি। ভালোর জন্য। সুন্দরের জন্য। মুক্তির জন্য।

এই ভাবনা আমাদের মনে বাসনা তৈরি করে। মনে শক্তির সঞ্চার করে। উদ্যমী হতে শেখায়। কর্মদক্ষ হতে শেখায়। কারণ আমি যখন ভাবব আমি রাজা,

তখন আমার মনে রাজার মতো কাজ করার বাসনা তৈরি হবে। অন্যের দুঃখ-কষ্ট, সুবিধা-অসুবিধা দেখতে হবে। যে-কোনো সমস্যার সমাধান দিতে হবে। এই পরিবেশ প্রকৃতি রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। আমি এই পৃথিবীকে বিপন্ন হতে দেবো না। কেবলই সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র কবিতাটির কথা মনে হতো– 'চলে যাব- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল/এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

এমন ভাবনা যদি কেউ ভাবে তাহলে সে কখনো পথ হারাবে না। তার হাতেই নিরাপদ সমাজ 'জাতি' রাষ্ট্র। নিরাপদ মানুষ। নিরাপদ পৃথিবী। তাই তো বলতে ইচ্ছে করে–

'আমরা এখন সবাই রাজা
নেই মন্ত্রী নেই প্রজা।'

আমরা সেই মানুষ হতে চাই- যে ব্যক্তি ও সমাজকে মন্দ বা খলচরিত্রের মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। মানুষের বিপদে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা সবসময় সেই হিরো বা বীরের খোঁজ করি।

### আমাদের লোকাল হিরো

আমরা প্রায়ই পত্র পত্রিকায় এবং টেলিভিশনে শিশু কিশোরদের বীরত্বের খবর পাই। সেসব খবর পাঠ করে বা জেনে আমরা অনুপ্রাণিত হই। মনে হয় আমরাও তো তাদের মতো হতে পারি। সুযোগ পেলে তাদের মতো কাজ করতে পারি। অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো তেমনই তিনটি খবর সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো। এদের সবার বসবাস শহরের বাইরে হওয়ায় এদের 'লোকাল হিরো' বলা হলেও তারাই আমাদের কাছে প্রকৃত বীর।

### ট্রেন থামিয়ে দিল টিটোন ও সিহাবুর

ওরা দুই বন্ধু মিলে আস্ত একটি ট্রেন থামিয়ে দিল। তারা দেখল রেললাইন ভাঙা। এই ভাঙা রেললাইন দিয়ে তেলবাহী ওই ট্রেনটি কোনোভাবেই যেতে পারবে না। এজন্য তারা চিন্তা করল যেভাবেই হোক ট্রেন থামাতে হবে। তা না হলে ঘটে যাবে বড়ো দুর্ঘটনা। এজন্য সিহাবুর (৬) তার গলায় বাঁধা মাফলার খুলল। টিটোন (৭) ও সিহাবুর মিলে মাফলারের দুই মুখ ধরে

## সোনালি হাত ও নীল সমুদ্রের গল্প

### রক্ত দিয়ে লক্ষ শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছেন হ্যারিসন

তাঁকে ডাকা হয় সোনালি হাতের মানুষ হিসেবে। কারণ তিনি এ পর্যন্ত মোট ১,১৭৩ বার রক্ত দিয়েছেন। তার দেওয়া রক্তে প্রাণ বেঁচেছে ২৪

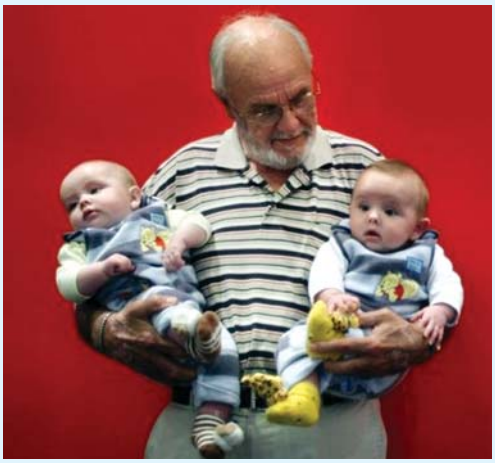

লাখ শিশুর। নাম তার জেমস হ্যারিসন। ৭৪ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয় এই নাগরিককে একজন প্রকৃত বীর বলা চলে। কারণ গত ৫৪ বছরে ২৪ লাখেরও বেশি রোগাক্রান্ত শিশুর জীবন রক্ষা পেয়েছে তাঁর দেওয়া রক্তে। শুনতে বিস্ময়কর হলেও ঘটনা সত্য। হ্যারিসনের রক্তের প্লাজমায় এমন এক ধরনের এন্টিবডি রয়েছে, যা শিশুদের মারাত্মক ধরনের রক্তশূন্যতা 'রেসাস ডিজিজ' আরোগ্য করতে সক্ষম।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি বছর সহস্রাধিক শিশু আরএইচ অর্থাৎ রেসাস রোগে মারা যায়। এই রোগের কারণে অনেক শিশুর মস্তিষ্ক চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় জেমসের রক্ত এতই মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায় যে, তার জীবন বীমার পরিমাণ হয় ১০ লাখ অস্ট্রেলিয় ডলার।

### চার শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিলেন সাফিয়া

নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিলে সমুদ্রের অথৈ পানিতে প্রায় তলিয়ে যাওয়া চার শিশুকে বাঁচিয়েছেন সাফিয়া নামে বাংলাদেশি এক নারী। আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবির একটি সমুদ্র সৈকতে ২০১৪ সালের ১লা নভেম্বর এই ঘটনা ঘটে।

আবুধাবির দাবিয়া সমুদ্র সৈকতের অথৈ পানিতে নেমে যাচ্ছিল ৬-১০ বছর বয়সী চারটি শিশু। এসময় পাশেই ছিলেন সাফিয়া। চার অবুঝ শিশুর কাণ্ড দেখে চিৎকার করতে থাকেন তিনি। আশপাশে কাউকে না পেয়ে সাফিয়া নিজেই চার শিশুকে ফেরাতে সৈকতে নেমে পড়েন। সাফিয়া ও চার শিশুর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ততক্ষণে চলে এসেছে ঘটনাস্থলে। সাফিয়া একে একে চার শিশুকে অক্ষত অবস্থায় মা-বাবার হাতে তুলে দেন। কিন্তু নিজে সমুদ্র থেকে ফিরে আসার সময় তুমুল স্রোত সাফিয়াকে তলিয়ে নিয়ে যায়। সাফিয়া সাঁতার কেটে আবার তীরে আসতে চান। কিন্তু সর্বনাশা ঢেউ তাকে টেনে নিয়ে যায়। আবার আরেকটি ঢেউ তাকে আছড়ে ফেলে সৈকতের পাথরের ওপর।

উদ্ধার হওয়া চার শিশুর মধ্যে একজনের বাবা আবু আবদুল্লাহ বলেন, আমরা যখন সাফিয়াকে টেনে তুলি তখন তার জ্ঞান ছিল না। গুরুতর জখমের কারণে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা যান। তিনি বলেন, এই নারী আমার সন্তান ও তার তিন বন্ধুকে বাঁচিয়ে বীরত্ব দেখিয়েছেন। আমরা তার বীরত্বের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম। ■

ট্রেন থামানোর সংকেত দিতে লাগল। অবশেষে ট্রেন থেমে গেল। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে। ওই দিন সকাল সাড়ে নয়টার দিকে রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী রেলওয়ে স্টেশনের ৪শ মিটার দূরে ঝিনা রেলগেটে এই ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর পাবনার ঈশ্বরদী থেকে মিস্ত্রি নিয়ে রেল লাইন মেরামত করা হয়। দুই ঘণ্টা পর বাঘা-রাজশাহী রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। তেলবাহী ট্রেনটি খুলনা থেকে রাজশাহী যাচ্ছিল।

বাঘা উপজেলার ঝিনা গ্রামের সুমন আলীর ছেলে সিহাবুর রহমান ও শহীদুল ইসলামের ছেলে টিটোন আলী মুহূর্তেই হিরো হয়ে যায় সবার কাছে। শিশু দুটিকে কোলে নিয়ে সবাই উল্লাশ করতে থাকে।

তেলবাহী ওই ট্রেনের চালক কেএম মহিউদ্দিন জানান, দুই শিশু লাল রঙের মাফলার দিয়ে ট্রেন থামানোর সংকেত দিচ্ছিল। লাল মাফলার দেখে তিনি প্রথমে গুরুত্ব দেননি। ট্রেন থামাবেন না বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছানোর পরও যখন শিশু দুটি রেললাইন থেকে সরছিল না তখন তিনি ট্রেনটি থামিয়ে দেন। ট্রেন থেকে নিচে নেমে দেখেন রেললাইন ভাঙা। এই দুই শিশুর সাহসিকতা, দূরদর্শিতা, বীরত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। বিস্মিত করে।

### ১০ জনের জীবন বাঁচানো 'বীর শিশু' সুমনের গল্প

সুমন হোসেনের বয়স মাত্র ১২ বছর। সপ্তম শ্রেণিতে লেখাপড়া করে চলনবিল হান্ডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই বয়সে সে ভীষণ করিৎকর্মা, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সাহসী। গাছে ওঠা, মাছ ধারা, সাইকেল কিংবা নৌকা চালানো তার কাছে কোনো ব্যাপারই না। তারই

প্রমাণ মিলল গত ৩১শে আগস্ট ২০১৮ শুক্রবার সন্ধ্যায়। ওই দিন পাবনার চলনবিলের পাইকপাড়ায় ২২ জন যাত্রী নিয়ে একটি নৌকা ডুবে যায়। এতে ৫ জন প্রাণ হারায়। যাত্রীদের মধ্যে ১০ জনই বেঁচে যায় শিশু সুমনের উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসিকতায়। এই মানবিক ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে 'বীর শিশু' উপাধি দিয়ে পুরস্কৃত করেন পাবনা জেলা প্রশাসক। সুমন জেলার চাটমোহর উপজেলার হান্ডিয়াল পাইকপাড়া গ্রামের দরিদ্র কৃষক আব্দুস সামাদ ও সুফিয়া খাতুনের ছেলে।

ঘটনার সময় সুমন বিলের মধ্যে ছোটো একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে প্রতিবেশী এক চাচাকে পার করে বাড়ি ফিরছিল। এমন সময় তার পাশেই ২২ জন যাত্রী নিয়ে একটি নৌকা ডুবে যায়। ডুবে যাওয়া যাত্রীদের চিৎকার শুনে সুমন দ্রুত নৌকা নিয়ে যায় ঘটনাস্থলে। সবাইকে তার নৌকা ধরতে বলে। এসময় তাদের ডিঙিতে না তুলে শুধু নৌকা ধরা অবস্থায় বিলের পাড়ে নিয়ে আসে। কেউ কেউ সাঁতরে আসে বিলের পাড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন আসে। ডুবে যাওয়া যাত্রীদের খুঁজতে থাকে। ডুবুরিদের উদ্ধার কাজেও সহায়তা করে সুমন। সবাই তো সুমনের কাণ্ড দেখে অবাক।

এ বিষয়ে শিশু সুমন জানায়, ঘটনার সময় নৌকার ছইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে যাত্রীরা মোবাইলে সেলফি তুলছিল। এমন সময় ছই ভেঙে যায়। সবাই তাড়াহুড়া করে ছই থেকে নামতে গেলে নৌকাটি কাত হয়ে ডুবে যায়। আমি তখন সেখানে গিয়ে তাদের উদ্ধার করি।

সুমনের বাবা কৃষক আব্দুস সামাদ বলেন, যদিও আমরা গরিব, তবে ছেলের এমন কাজ দেখে সব দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে গেছি। হান্ডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমার বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী মানবতার সেবায় যে ভূমিকা রেখেছে তাতে আমি গর্ববোধ করি। এ বিষয়ে পাবনার জেলা প্রশাসক মো. জসিম উদ্দিন বলেন, সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সুমন একজন বীর। সে একাই ১০ জনকে উদ্ধারে সাহসী ভূমিকা রেখেছে। তার শিক্ষার সহায়তার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

### পল্লির মানুষের সেবা করেন তথ্যকল্যাণী মাহফুজা

পরনে গোলাপি নীল রঙের সালোয়ার কামিজ। মাথায় টুপি। বাহন সাইকেল। সঙ্গী ল্যাপটপসহ আরো কিছু উপকরণ। এই হচ্ছেন তথ্যকল্যাণী মাহফুজা। কাজ পল্লির মানুষের সেবা করা। বর্তমানে দেশের পাঁচটি জেলায় প্রায় ৫০ জন তথ্যকল্যাণী কাজ করছেন। এদের মধ্যে মাহফুজা আক্তার অন্যতম। কাজের

স্বীকৃতিস্বরূপ জার্মানির প্রধান বেতার সার্ভিস ডয়চে ভেলে থেকে পেয়েছেন গ্লোবাল মিডিয়া ফোরাম অ্যাওয়ার্ড।

মাহফুজা উচ্চ মাধ্যমিক পাস। তথ্যকল্যাণী হিসেবে কাজ করছেন ২০১০ সাল থেকে। গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী ইউনিয়নে তাঁর নিজের গ্রামসহ কাজ করেন আশেপাশের পাঁচটি গ্রামে। কী কাজ করেন মাহফুজা? প্রশ্নের জবাবে মাহফুজা বলেন, কী না করতে হয়। ডায়াবেটিস ও প্রেসার মাপা, গর্ভবতীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া থেকে শুরু করে নষ্ট মোবাইল সারানো, যেসব গ্রামবাসীর আত্মীয় দেশের বাইরে থাকেন তাদের সঙ্গে স্কাইপে কথা বলিয়ে দেওয়া, শিশুদের ভিডিও দেখানোর মাধ্যমে লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগানো, কারো অনুষ্ঠানে ছবি তুলে সেগুলোর প্রিন্ট দেওয়া, ভিডিও করা, মানুষের চিঠিপত্র লিখে দেওয়া, চাকরির আবেদপত্র

লিখে দেওয়া এমন সব কাজই করতে হয় আমাকে। শুধু তাই নয়, মাহফুজা ল্যাপটপে স্কাইপের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের ঢাকায় থাকা সাংসদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ করে দেন। সত্যিই মাহফুজা একাই দু-শো। একা যে দু-শো সে কি বীর নয়?

**বাড়িয়ে দাও তোমার হাত**

আগেই বলেছি বীরত্বের কোনো বয়স নেই। যে-কোনো বয়সেই মানুষ বীর বা হিরো হতে পারে। টিটোন, সুমন, সিহাবুর, মাহফুজা তার প্রমাণ। তাছাড়া নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিশু-কিশোররাও প্রমাণ করেছে তারা বীর। তারাই ইতিহাসের নতুন কাণ্ডারি। কারণ তারা আন্দোলনকারীদের বাধা দিতে আসা পুলিশদের ফুল দিয়ে সহনশীলতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। পুলিশের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং মানুষের মনে সাহস জুগিয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। তারা দেখিয়ে দিয়েছে রাস্তায় সুশৃঙ্খলভাবে গাড়ি চালানো যায়। ঢাকার যানজট ও পরিবহন সমস্যার সমাধান করা যায়। রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ভয়কে জয় করা যায়। জীবনের পক্ষে, মানুষের পক্ষে ভালোবাসা নিয়ে দাঁড়ানো যায়। অতিমানবীয় কোনো শক্তি বা ক্ষমতায় বলীয়ান না হয়েও হিরো বা বীর হওয়া যায়। শুধু প্রয়োজন সব মন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা এবং সাহস। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে জ্বলে ওঠার প্রত্যয়। তাই তো বাড়িয়ে দাও তোমার হাত। ছড়িয়ে দাও তোমার মনের সবটুকু আলো। ■

# স্ট্যান লি

## সুপার হিরোদের সুপার হিরো

**রূপন্তী রায়**

কমিক ভালোবাসি, আর সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যানকে চিনি না, তা তো হতে পারে না, তাই না? বলতে পারো, এই কমিক সুপার হিরোদের সৃষ্টি করেছেন কে? যাঁর ভাবনা আর তুলির আঁচড়ে গল্পে গল্পে সেজে উঠেছিল এই সুপার হিরোরা, তিনিই আসলে এদের সুপার হিরো। তাঁর নাম স্ট্যান লি। পুরো নাম স্ট্যানলি মার্টিন লিবার।

আমেরিকান এই কমিকম্যান একাধারে বই লেখক, সম্পাদক, প্রযোজক ও প্রকাশক। ছিলেন বিশ্বখ্যাত কমিক প্রতিষ্ঠান মার্ভেল কমিকসের প্রধান সম্পাদক। জ্যাক কার্বি ও স্টিভ ডিটকোর সাথে যৌথভাবে তিনি এনেছেন স্পাইডারম্যান, হাল্ক, ডক্টর স্ট্রেঞ্জ, ফ্যান্টাস্টিক ফোর, ডেয়ারডেভিল, ব্ল্যাক প্যান্থার এবং এক্স-ম্যানকে। ল্যারি লিবার ছিলেন স্ট্যান লি'র ভাই। দুই ভাই মিলে সৃষ্টি করেছেন অ্যান্টম্যান, আয়রনম্যান আর থর চরিত্রকে।

১৯৩৯ সালে টাইমলি কোম্পানি নামে যাত্রা শুরু করে মারভেল কমিক। প্রতিষ্ঠানটি ছিল লি'এর এক আত্মীয়ের। মার্ভেল কমিকস ব্যবসা সফল হয় যখন এর প্রতিষ্ঠাতা স্ট্যান লি, জ্যাক কিরবি , স্টিভ ডিকোর সুপার হিরো চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেন।

প্রথম এসেছিল ফ্যান্টাস্টিক ফোর। স্ট্যান লি ১৯৬১ সালে লী দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফোর ফর মার্ভেল কমিকস তৈরি করেন। সেই থেকে তাকে পপ কালচারের জনক হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। মার্ভেল কমিকসকে ভিত্তি করে মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স তৈরি করা হয়েছে, যেখানে এর জনপ্রিয় কমিক চরিত্রগুলো নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে।

মার্ভেলের বহু চরিত্র সে সময় জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে যায়। বছরে মার্ভেলের ৫ কোটি কপি বিক্রি হতো। ভাবা যায়! কেনই বা হবে না? প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে লি সংমিশ্রণ করেছেন সে সব বৈশিষ্ট্যের যেগুলো প্রতিটি ছেলেমেয়ে তাদের কিশোর বয়সে মুখোমুখি হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, এখনো হচ্ছে। যেমন ব্রন হওয়া, খুশকির সমস্যা, হাত পায়ের নখ বাড়তে থাকা ইত্যাদি।

তার 'ব্ল্যাক প্যানথার ইতিহাসের প্রথম কোনো কমিক সুপার হিরো, যার গায়ের রং কালো। অন্ধ সুপার হিরো ডেয়ারডেভিল এবং মানবতার প্রতিমূর্তি সিলভার সার্ফার যোগ করেছিল কমিকস জগতে নতুন মাত্রা। এর কৃতিত্ব লি-এর হলেও প্রতিটি কমিক চরিত্রের আঁকিয়েদের কৃতিত্ব দিতেও ভুলতেন না লি। এ কারণে তার নামের সঙ্গে সঙ্গে কমিকস পাগলদের কাছে প্রিয় নাম হয়ে ওঠে কারবি, ফ্র্যাঙ্ক মিলার, জন রমিটান্ডসহ আরো অনেক শিল্পী।

১৯৯৪ সালে কমিক বই শিল্পের উইল এইসনার অ্যাওয়ার্ড হল অব ফেমে এবং ১৯৯৫ সালে জ্যাক কার্বি হল অব ফেমে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৮ সালে তিনি লাভ করেন ন্যাশনাল মেডেল অব আর্টস।

লি-এর জন্ম ১৯২২ সালে। তাঁর পরিবার আমেরিকায় এসেছিল রোমানিয়া থেকে। কমিক চরিত্র তৈরির অসাধারণ পারদর্শিতার কারণে মাত্র ১৮ বছর বয়সে সম্পাদকের পদ লাভ করেন তিনি।

১৯৭১ সালে মারভেল থেকে অবসর নেন লি। তবে কমিকস জগৎ থেকে তখনও তিনি বিদায় জানান নি। ২০০১ সালে পারভিওর অফ ওয়ান্ডার- পিওডব্লিউ নামে নতুন একটি এন্টারটেইনমেন্ট প্রতিষ্ঠান চালু করে কমিকস চরিত্রগুলোকে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রোগ্রামে নিয়ে আসেন। এক্স মেন, স্পাইডারম্যান, আয়রন ম্যান, ফ্যান্টাসটিক ফোর, ক্যাপ্টেন আমেরিকা, হাল্ক, ডেয়ারডেভিল এবং অ্যাডভেঞ্জার্সকে নিয়ে হলিউড চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে যার বেশিরভাগের খ্যাতি ছিল আকাশচুম্বী। রবার্ট ডাউনির আয়রনম্যান একটি সিনেমা থেকে আয় করে ২৪০ কোটি ইউএস ডলার।

২০১৮ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে এই গ্রেট সুপার হিরো স্ট্যান লি চিরতরে চলে গেছেন অজানা জগতে। তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচানব্বই বছর। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ভেবেছেন নতুন নতুন সৃষ্টির কথা। সুপার হিরো সৃষ্টির নেশা তো কম কিছু নয়, তাই না? ■

# আগামী দিনের সুপার হিরো

শামস নূর

ইংরেজিতে সুপার হিরো, বাংলায় মহাবীর, মহাবীর পুরুষ, মহাবলশালী প্রভৃতি কাছাকাছি সব শব্দ। সুপার হিরো শব্দটি এসেছে সুপারিয়র হিরো (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বীরপুরুষ) শব্দটি থেকে। সুপার হিরো সম্পর্কে বলা যায় ব্যতিক্রমী গুণাবলি ও শক্তিসম্পন্ন একজন মানুষ। তিনি অসাধ্যকে সাধন করেন, অসম্ভবকে সম্ভব করেন, অজেয়কে জয় করেন; আর সে কারণেই বলা যায় 'সুপার হিরো' অলৌকিক বা বীরত্বপূর্ণ গুণাবলি সম্পন্ন একজন মানুষ। যিনি বিস্ময়কর গুণাবলির অধিকারী, দুঃসাধ্য সব কাজ যিনি চোখের পলকেই করে ফেলতে পারেন। অজেয়কে জয় করে ফেলেন নিমিষেই। সোজা কথায় বলা যায়–সাধারণ মানুষের কাছে যে কাজ কল্পনাতীত কিংবা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, সুপার হিরোরা তা অনায়াসেই করতে সক্ষম।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে 'মহানায়ক' শব্দটি অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র নায়কের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি সুপার হিরোর বাংলা কাছাকাছি শব্দ হলো অতিমানব। সুপার হিরো বহুল পরিচিত কাল্পনিক চরিত্র। যে লাল ও নীল রঙের আস্তিন বিহীন ঢিলেঢালা ঊর্ধ্ব পোশাক পরে থাকে। অন্যায় থেকে মানুষকে রক্ষা করতে বা আশ্রয় দান করতে মহাশূন্যে ওড়াসহ যে-কোনো অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। যে-কোনো রূপ ধারণ করে ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হয়ে তার অতিমানবিক সামর্থ্যের পরিচয় দিয়ে থাকে।

**আগামীর সুপার হিরো কারা?**
**সাধারণ মানুষের পক্ষে কি সুপার হিরো হওয়া সম্ভব?**

মানুষ বরাবরই ভবিষ্যতমুখী। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই সে বর্তমানে কাজ করে চলেছে।

এক সময় যা মানুষের কাছে একবারেই অসম্ভব ছিল, অজানা ছিল কিংবা ছিল সাধ্যাতীত পরবর্তীতে সেই কাজই মানুষ সম্ভব করে তোলে। এক সময় মানুষ হেঁটে হেঁটে কিংবা ঘোড়া বা গাধার পিঠে চড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করত। এরপর ঘোড়ার সাথে গাড়ি জুড়ে দিয়ে সেই গাড়িতে যাতায়াত শুরু করে।

এরপর মানুষের ভাবনায় এল আরো দ্রুত, আরো গতির কোনো বাহন। এরপর তারা তৈরি করল বাহন যন্ত্রচালিত গাড়ি। এখন মানুষ উড়ুক্কু গাড়ি, স্বয়ংক্রিয় গাড়ি তৈরির খুব কাছাকাছি চলে গেছে। আগামী বছরগুলোতে এসব গাড়ি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

এক সময় মানুষ আকাশে ওড়ার কথা ভাবতেই পারেনি। উড়োজাহাজ আবিষ্কার তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে। এরপর উড়োজাহাজ থেকে রকেট আবিষ্কারের মধ্য

দিয়ে মানুষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে চলে যায়। এরপর চাঁদেও পা রাখে। সৌরজগতের অন্য গ্রহগুলোতে মানুষ না গেলেও মানুষের সৃষ্ট স্যাটেলাইট গ্রহগুলো স্পর্শ করেছে। এখন মানুষ নিজেই অন্য গ্রহে বসবাসের কথা ভাবছে। আগামীতে সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

যারা মানুষের এসব অসম্ভব স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছেন, তারাই আগামীতে আমাদের মাঝে সুপার হিরোর মর্যাদা পেতে যাচ্ছেন নিঃসন্দেহে।

মানুষের ভবিষ্যৎ সব সময়ই অনিশ্চিত। তা আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে কী হবে তা সত্যিই জানি না। মানুষ কি সত্যি সত্যি অন্য গ্রহে পাড়ি জমাতে পারবে না, কি তার আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে এ পৃথিবীর সভ্যতা! সহজ কথায় বলা যায়, আমরা একটা প্রতিযোগিতার মধ্যে আছি। আর সময়ের বিরুদ্ধেই যেন এই প্রতিযোগিতা। মানুষ এখন যেমন খুব সচেতনভাবে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা কিংবা লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে এমনটি বোধ হয় আগে সে কখনোই পারেনি। বলা যায় মানুষ এখন যেন তার ভবিষ্যতকে দেখতে পারছে।

মানুষের ভবিষ্যৎ এখন সমস্ত মানব সভ্যতার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুমকিও হয়ে উঠেছে। আশঙ্কার পাশাপাশি আশাও রয়েছে। সুদূর ভবিষ্যতের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না। ২০৫০ সাল পর্যন্ত একটা মাইল ফলক ঠিক করে ফেলেছে মানুষ। ২০৫০ সাল পর্যন্ত কী কী হবে, তা-ই এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবে বা যে গতিতে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে, এই ২১ শতকের মধ্যেই হয়ত মানুষের সভ্যতা ছাড়িয়ে যাবে তার কল্পনার সীমানা। আর আজকেই যেই অসম্ভব কিছু আগামীতে যারা সম্ভব করে তুলবে তারাই হবে আমাদের এ বিশ্বের আগামীর সুপার হিরো।

**চাঁদে বসতি এক দশকেই!**

সম্প্রতি জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জাপান অ্যারোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি বা জাক্সা পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদে মানুষের কলোনি স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা-র সহায়তায় আগামী দশকের মধ্যে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা জানিয়েছে সংস্থাটির বিজ্ঞানীরা। শুধু কী তাই, আগামীতে এক্সোপ্লানেট যাত্রা বিরতির স্থান হিসেবে চাঁদকে ব্যবহারের পাশাপাশি সেখান থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ আহরণের গবেষণাও শুরু হবে ওই সময়ের মধ্যে। ২০১৩ সালে চীনের জেড র‍্যাবিট লোনার রোভারের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়েই এই পথে এগোচ্ছে জাপান।

জাপানি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান শিমিজু করপোরেশন-এর মুখপাত্র হিদেও ইমামুরার দাবি, ১৯৮৭ সাল থেকে চাঁদে বসতি স্থাপনের চিন্তা করছেন তারা। তখন থেকেই তাদের বিশ্বাস, এমন একদিন আসবে যখন মানুষ চাঁদে বসবাস করতে শুরু করবে। তবে পর্যাপ্ত সম্পদের অভাবে সেখানে মানুষ বাস করতে পারবে কিনা সেই অনিশ্চয়তার কারণে এ বিষয়ে এতদিন কেউ উদ্যোগ নেয়নি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ যন্ত্র এম-৩ তিনটি রাসায়নিক চিহ্ন বের করে নিশ্চিত করেছে চাঁদে পানি থাকার বিষয়টি।

২০০৯ সালে জাপানের মহাকাশযান কাগুইয়া চাঁদে গিয়ে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, ক্যালসিয়াম, টাইটেনিয়াম ও আয়রনের উপস্থিতি শনাক্ত করে। এর পাশাপাশি গত ২০১৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সৌরজগৎ সম্পর্কে আরো গবেষণা চালাতে চাঁদে আবার মহাকাশচারী পাঠানোর এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। আর এসব কারণে জাপান চাঁদে বসতি স্থাপনের বিষয়ে এতটা আশাবাদী। শিমিজু-র তথ্য মতে, সীমিত সম্পদের ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার চেয়ে কীভাবে অফুরন্ত ক্লিন এনার্জি উৎপাদন করা যায়, দীর্ঘদিন ধরে সেই সন্ধান চালিয়ে আসছেন বিজ্ঞানীরা।

উদ্ভাবনী ভাবনা ও অগ্রসর প্রযুক্তি লুনা রিং, মানুষের এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে চাঁদের ৪০০ কিলোমিটার সোলার প্যানেল দিয়ে ঘিরে ফেলতে চায় শিমিজু। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ সংগ্রহ করা হবে পৃথিবীতে। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে 'লুনা রিং'। বিশেষজ্ঞদের মতে, চাঁদে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমাট বাঁধা পানি এবং পর্যাপ্ত লৌহ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে হিলিয়াম-৩ গ্যাসের উপস্থিতি, যা কেবল চাঁদেই পাওয়া যায়। এই গ্যাসকে সহজেই নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগানো সম্ভব বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এদিকে নির্মাণ কাজে দূর নিয়ন্ত্রিত

ট্রাক ও বুলডেজার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানটি কাজিমা পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য কিছু নির্মাণ যন্ত্র ইতোমধ্যে চাঁদে পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির গবেষকদের মতে, তাদের এই প্রযুক্তি পৌনে ৪ লাখ কিলোমিটার দূরেও কাজ করবে। বর্তমানে চাঁদে লঞ্চ প্যাড এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সব অবকাঠামো নির্মাণ, স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া আবহাওয়া ও টেলিকমিউনিকেশন সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া এবং চাঁদের পৃষ্ঠে সঠিকভাবে কাজ করবে এমন প্রযুক্তি ও যন্ত্র নির্মাণ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি। আর সবকিছু ঠিক থাকলে পরিকল্পিত সময়ের মধ্যেই চাঁদে মানুষের কলোনি নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যাবে। চাঁদে গিয়ে বসবাসের ক্ষেত্রে যারা হবেন পথিকৃৎ তারাই হবেন আমাদের কাছে আগামী দিনের সুপার হিরো।

**মঙ্গলগ্রহে পাড়ি জমাবে মানুষ**

এখন মানুষের সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন হলো অন্য কোনো গ্রহে পাড়ি জমানো। আর এজন্য পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ মঙ্গলই তার লক্ষ্য। বিজ্ঞানীদের মতে, আগামী ১০ বছরের মধ্যে মঙ্গলগ্রহেই হবে মানুষের প্রথম অবতরণ। বর্তমানে এ নিয়ে কাজ করে চলেছে নাসা-সহ বিশ্বের বিখ্যাত সব প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলো। টেসলার প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী এলন মাস্ক এ ব্যাপারে এগিয়ে আছেন সবচেয়ে বেশি। স্পেস এক্স-এর সঙ্গে এলনের টেসলা কোম্পানি এ ব্যাপারে একসঙ্গে কাজ করে চলেছে। মহাকাশে বসতি গড়ার ক্ষেত্রে তারা এরই মধ্যে প্রজেক্ট শুরু করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (১৯৪২–২০০৮) জীবিতাবস্থায় এ ব্যাপারে বার বার তাগাদা দিয়ে গেছেন। পৃথিবীর বর্তমানে যে অবস্থা তাতে করে খুব দ্রুত অন্য কোনো গ্রহে মানুষের পাড়ি জমানো উচিত। মঙ্গলগ্রহের জলবায়ু দেখে নিশ্চিত হওয়া গেছে সেখানে খুব সহজেই মানুষের পক্ষে বসতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তারপর একদিন হয়ত মানুষ পাড়ি জমাবে অন্য কোনো গ্রহে। যে পথ আরো দূরে, আরো দুর্গম। তবে আপাতত তার লক্ষ্য মঙ্গলেই থাকুক, আর বর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি জীবিত মানুষেরই আকাঙ্ক্ষা সে বেঁচে থাকতেই মঙ্গলে মানুষের পদচারণা দেখে যাবেন। যারা মঙ্গলে প্রথম পা রাখবেন–তারাই হবেন আমাদের আগামীর সুপার হিরো।

**দেড়শ-দুইশ বছর হবে মানুষের গড় আয়ু**

বর্তমান যুগকে বলা হয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের যুগ। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মানুষ এরই মধ্যে মুক্তি পেয়েছে। এখন অনেকটা সুলভ হয়েছে ক্যানসার চিকিৎসা। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে ক্যানসারে। আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ। ২০ লাখ মানুষকে যে বাঁচানো যাচ্ছে এটাই বিরাট সাফল্য। কেননা এক সময় ক্যানসারের তো নিশ্চিত পরিণাম ছিল মৃত্যু। ধারণা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতের বিশ্বে ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের বাঁচানোর সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়বে। হয়ত এক সময় তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। মানবদেহের জিন থেকেই ক্যানসার নিরাময়ের কোষ শনাক্ত করে তা আগেই অপসারণ করা সম্ভব হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, শুধু রক্ত পরীক্ষা করেই ক্যানসার শনাক্ত করা সম্ভব হবে খুব তাড়াতাড়ি। এতদিন ক্যানসার শনাক্ত করতেই অনেক দেরি হয়ে যেত। শুধু ক্যানসার নয়–স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, ডায়াবেটিস রোগকেও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা হবে শিগ্‌গির। আর এর জন্য বড়ো কোনো ধরনের অপারেশন নয়, শুধুমাত্র ওষুধ খেয়েই এ ধরনের রোগ নিরাময় সম্ভব হতো। তার চেয়েও বড়ো কথা, ভবিষ্যতে বিশ্বের মানুষ অসুস্থ হলেও হয়ত আর ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। রোবটই করবে যাবতীয় সব চিকিৎসা এমনকি অপারেশন পর্যন্ত। উন্নত কম্পিউটার সমৃদ্ধ মেডিকেল যন্ত্রপাতি শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে বলে দেবে কোথায় কী রোগ আছে। তারই ওপর ভর করে মানুষ অমরত্বের স্বপ্ন দেখছে। কম্পিউটারের যন্ত্রপাতির মতো মানুষের শরীরের সব অকেজো

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে বদলে দেওয়া সম্ভব হবে।

এখনই তো বেরিয়ে গেছে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড। মস্তিষ্ক হয়ত বদলানো সম্ভব হবে না। তবে মস্তিষ্ক কোষকে আরো সচল ও সতেজ রাখার ব্যবস্থা চিকিৎসাবিজ্ঞান করবে। অমরত্ব লাভ না হলেও বাড়বে গড় আয়ু। ভবিষ্যত বিশ্বের মানুষের আয়ু হয়ত হবে দেড়শ-দুইশ বছর। যাদের ফলে আগামীতে মানুষের মন এমন রোগমুক্তি ও দীর্ঘজীবন লাভ করবেন তারাই হবেন আগামী দিনের সুপার হিরো।

**উড়ুক্কু গাড়ি**

সম্প্রতি উবার ও নাসা উড়ুক্কু গাড়ি নিয়ে একসাথে কাজ করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০২০ সালের মধ্যে উড়ুক্কু গাড়ি প্রকল্পে পরীক্ষা শুরু করার আশা করছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। গাড়ি বলতে আমাদের চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে তা হলো গাড়ি রাস্তায় চলাচল করবে কিন্তু উড়ুক্কু গাড়ি চলবে আকাশে! উড়ুক্কু গাড়ি প্রকল্পের জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা বানাতে সহায়তার জন্য অ্যাপভিত্তিক ট্যাক্সি সেবাদাতা উবার-এর সঙ্গে চুক্তি করেছে নাসা। সম্প্রতি উবার জানিয়েছে তারা 'মনুষ্যহীন যান ব্যবস্থাপনা'র উন্নয়নে নাসার সঙ্গে স্টেপইস অ্যাক্ট এগ্রিমেন্টে সই করেছে। কীভাবে ড্রোনের মতো মনুষ্যহীন আকাশযান ব্যবস্থাগুলো (ইউএএস) নিম্ন উচ্চতায় নিরাপদে ওড়ে তা বের করতে এই চেষ্টা চালাচ্ছে নাসা। উবার এমন আকাশযান বানাতে চাচ্ছে যা খাড়াভাবে উঠবে ও নামবে; উল্লেখ্য এই গাড়িগুলো নিম্ন উচ্চতায় উড়বে। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মার্কিন সরকারের কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করল উবার। নাসা এই একই বিষয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও কাজ করেছে বলে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনবিসিকে উল্লেখ করা হয়েছে। উবার-এর পক্ষ থেকে জানা গেছে, ২০২০ সালে অন্যান্য শহরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের লসএঞ্জেলসেও পরীক্ষা চালানোর পরিকল্পনা করছে।

২০১৮ সালে লসএঞ্জেলসে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিকের আগে উড়ুক্কু ট্যাক্সি সেবা চালুর লক্ষ্য নিয়েছে উবার। উড়ুক্কু গাড়ি যারা সফলভাবে চলাচল নিশ্চিত করবেন তারাই হবে আগামীর সুপার হিরো।

**স্বয়ংক্রিয় গাড়ি**

বিশ্বে বর্তমানে ১ বিলিয়নের বেশি গাড়ি রয়েছে। এসব গাড়ি চলে তেল, গ্যাস, ডিজেল ও পেট্রোলে। আর এর ফলে পরিবেশ তো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছেই, ভবিষ্যতে এরকম গাড়ি আসছে যেগুলো চলবে বৈদ্যুতিক চার্জে আর সেগুলো কোনো দুর্ঘটনায়ও পড়বে না, হবে না মানুষের প্রাণহানি। কারণ সেগুলো কোনো মানুষ চালাবে না অর্থাৎ মনুষ্যবিহীন গাড়ি। সেসব গাড়ি চলবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা নিজে নিজে। সেই গাড়িতে প্যাডেল থাকবে না, থাকবে না কোনো স্টিয়ারিং। কেবল থাকবে শুধু একটা টাচ স্ক্রিন। রাস্তা আর গন্তব্য ঠিক করে দিলে সে নিজে নিজে নিয়ে যাবে তোমাকে, তা তুমি যেখানেই যেতে চাও সেখানে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মোটরস এরকম গাড়ির ডিজাইন আবিষ্কার করে ফেলেছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে এই গাড়ি তারা রাস্তায়ও চালিয়েছে। আরো জানিয়েছে ২০১৯ সালে গাড়িটি চূড়ান্তভাবে রাস্তায় থাকবে। জ্বালানি বাদে বৈদ্যুতিক ব্যাটারির চার্জে চলার ফলে পরিবেশও ঠিক থাকবে। ধারণা করা হচ্ছে, এ ধরনের গাড়িই হবে ভবিষ্যতে মানুষের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। গাড়ি শুধু মানুষের বাহনই হবে না, সঙ্গীও হবে। আরোহীর মন খারাপ হলে সে নিজেই পরিবেশ অনুযায়ী গান বাছাই করে

বাজাতে থাকবে। কোনো কিছু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠাতে হলে গাড়িই তা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসবে এর জন্য আর আলাদা লোকের প্রয়োজন হবে না। এ ধরনের স্বয়ংক্রিয় গাড়ি তৈরি ও বাস্তবায়নে যারা সফল হবেন তারাই হবেন আমাদের আগামী দিনের সুপার হিরো।

### প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ

আমাদের এই পৃথিবী এগিয়ে চলেছে ভয়ংকর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে। বর্তমানে এটাই বিশ্বের মানুষের সবচেয়ে বড়ো চিন্তার বিষয়। আর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণগুলো হলো– বায়ুদূষণ বা বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, গলে যাচ্ছে হিমবাহ, বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। আর এর ফলে তলিয়ে যাবার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চলগুলো। সবচেয়ে ভয়ের মধ্যে রয়েছে আমাদের মতো সমুদ্রতীরবর্তী নিম্ন আয়ের দেশগুলো। এ ধরনের সম্ভাব্য বিপর্যয়ের কার্যকর কোনো উদ্যোগই নেই। আর এই প্রতিরোধ করা কারো একার ওপর নির্ভর করে না। এর জন্য দেশ, রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণসহ পৃথিবীর সব মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে।

২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হয়। তাতে ১৯৬টি দেশ এই মর্মে স্বাক্ষর করে যে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা যেভাবেই হোক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে হবে। তাতে কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে। বাদ দিতে হবে জৈবিক জ্বালানি। পরিবেশবান্ধব জ্বালানির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু ২০১৭ সালে সেই চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের মতে, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থি। এই দেশটির অর্থনীতির জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যই বিশ্বের সব প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ করে ফেলেছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো। তুলে ফেলেছে ভূপৃষ্ঠের সব খনিজ সম্পদ– তেল, গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি। সেসবের জ্বালানিতে ভারি হয়ে উঠেছে বায়ুমণ্ডল। নদীগুলো দূষিত হয়ে পড়ছে, বাতাস দূষিত হচ্ছে, বাড়ছে রোগজীবাণু। জাতিসংঘের সূত্র মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে ২০০ মিলিয়ন মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। আরো অসংখ্য মানুষ বেকার হয়ে পড়বে।

এই মানুষেরা তখন ভিড় করবে শহরাঞ্চলে। আর এর ফলে বাড়বে ঘনবসতি। ঘনবসতি বাড়ার ফলে ভেঙে পড়বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। বাড়তে থাকবে যুদ্ধ আর হানাহানি। তবে যে কেবল ভয়ের কথাই রয়েছে তা কিন্তু নয়। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিশ্বের সব মানুষ এখন এক হচ্ছেন। তাদের কারো কারো মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে এরকম কথা 'এখন জলবায়ু চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানো হবে বিশ্বের সবার জন্য বিপদ। শুধু নিজের দেশ নয়, আমাদের এখন ভাবতে হবে সারা বিশ্বের কথা।'

সেইসব সচেতন আর বিবেকবান মানুষ যারা সারা বিশ্বকে সম্ভাব্য সব ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধে এগিয়ে আসবেন; যারা ভবিষ্যতে একটি সবুজ, সজীব, সুন্দর পৃথিবীর পথ দেখাবেন তারাই হবেন আগামী দিনের সুপার হিরো।

**পারমাণবিক যুদ্ধ ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫)পর থেকে মানুষের কাছে সবচেয়ে ভয়ংকর ও আতঙ্কের নাম পারমাণবিক যুদ্ধ। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র জাপানে আণবিক বোমা ফেলার পর রাশিয়া দ্রুত পারমাণবিক বোমা বানিয়ে ফেলে। এরপর পুরো শীতল যুদ্ধের সময়টা গেছে এই আতঙ্কে যে, কখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায় আর আমাদের এ বিশ্ব ধ্বংসের মুখে পড়ে। এরই মধ্যে ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফ্রান্সও পারমাণবিক বোমা বানানোর শক্তি অর্জন করে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়া মানেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা এখন আর এমন নয় যে, কার হাতে কতগুলো পারমাণবিক বোমা আছে। আর তাই ক্ষতিটা সবার জন্যই সমান। এ নিয়ে প্রখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও গণিতবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) খুব আতঙ্কিত ছিলেন। সারাজীবন তিনি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। এ বিষয়টি তিনি 'মানুষের কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে'– নামে একটি বইও লেখেন। এতে তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও আতঙ্কগ্রস্ত। এর কারণ হলো যেকোনো মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। আর পরাজিত শক্তি নিজের পরাজয় ঠেকাতে সর্বোচ্চ ভয়ংকর পরিকল্পনা বেছে নেবে। নাৎসি প্রধান ও স্বৈরশাসক হিটলারের কাছে যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) সময় পারমাণবিক বোমা থাকত, তাহলে তিনি তার বিস্ফোরণ ঘটাতেন।

এখনো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধেনি। বড়ো কোনো যুদ্ধও আর হয়নি। অনেকের মতে, পারমাণবিক শক্তি অর্জন বিশ্বকে একটা ভারসাম্য দিয়েছে। পারমাণবিক যুদ্ধ যেন না বাধে সেজন্য বিশ্বের সব রাষ্ট্রই এখন সচেতন। কারণ তা সবার জন্যই সমান ক্ষতি বয়ে আনবে। এর পরিণাম হলো সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞ, এমনকি মানব সভ্যতার বিলুপ্তি। মানব সভ্যতার এমন সম্ভাব্য বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য যেই বিবেকবান মানুষরা এখন এবং আগামীতে যারা ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে ও মানবতার পক্ষে এগিয়ে আসবেন তারাই হবেন আমাদের আগামীর সুপার হিরো। ■

## সারা বিশ্বের 'বাঙালি' সুপার হিরো

**আসমা আক্তার**

সারা বিশ্ব চেনে বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম। ১৮৫৮ সালে বাংলাদেশের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক জগদীশ ব্রিটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়েও পড়াশোনা করেন। গাছের প্রাণ আছে, তিনিই বলেছিলেন সবার আগে। প্রমাণও করেছিলেন তা। বেতার আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাঁরই।

২০২০-সালে ইংল্যান্ডের বাজারে আসতে চলেছে নতুন ৫০ পাউন্ডের নোট। নোটে ছাপানো হবে কোনো বিজ্ঞানীর মুখ, এমনই সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড। বাছাই প্রক্রিয়ায় উঠে আসে ১০০ জনের নাম আর প্রাথমিক নামগুলোর মধ্যেই রয়েছে বাঙালি এই বিজ্ঞানীর নাম।

বিশ্বখ্যাত সাময়িকী ফোর্বস-এর ৩০ বছর কম বয়সী শক্তি (এনার্জি) বিভাগে বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীর তালিকায় আছেন বাংলাদেশের সানি সানওয়ার এবং বিজ্ঞান বিভাগে রয়েছেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী জি এম মাহমুদ আরিফ পাভেল। সানি সানওয়ার লিথিয়াম-পলিমার ব্যাটারি প্যাক তৈরি করেন। কার্বন নিঃসরণ না করে বড়ো আকারের বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা যায় সানির এই উদ্ভাবনী প্রকল্প থেকে। পাভেল গবেষণা করেন মানবদেহের আয়ন চ্যানেল নিয়ে। এই আয়ন চ্যানেলে সমস্যা হলে কিডনিতেও সমস্যা হয়। তাঁর গবেষণা এ সমস্যা দূর করতে ভূমিকা রাখবে। ■

# বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

## তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

জানুয়ারির ১০ তারিখ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। পাকিস্তানের কারাগারে ২৯০ দিন থাকার পর ১৯৭২ সালের এই দিনে বেলা ১টা ৪১ মিনিটে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী তাদের পূর্ব পরিকল্পিত বাঙালি হত্যার নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' বাস্তবায়নের মাধ্যমে গণহত্যা চালায়। এ কারণে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেন। এর পরপরই পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে আটকে রাখে। সেখানে তিনি নয় মাস ১৪ দিন কারা ভোগ করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তার নির্দেশিত পথে মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। কারণ তিনিই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রেরণার উৎস।

নয় মাসের যুদ্ধের এক পর্যায়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ নিতে শুরু করে। জয় তখন সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একই সাথে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলা হয় প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠলে পাকিস্তানি বর্বর শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে মুক্তি দিতে।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে ১০ই জানুয়ারি সকালেই নামেন দিল্লিতে। সেখানে ভারতের জনগণের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন তিনি। বঙ্গবন্ধু ভারতকে বাংলাদেশের সাথে থাকার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। সেদিনই ভারত থেকে বঙ্গবন্ধু ঢাকা এসে পৌঁছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের আনন্দে আত্মহারা লাখ লাখ মানুষ ঢাকা বিমান বন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে সবার ত্যাগের কথা স্মরণ করেন। সবাইকে দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। ■

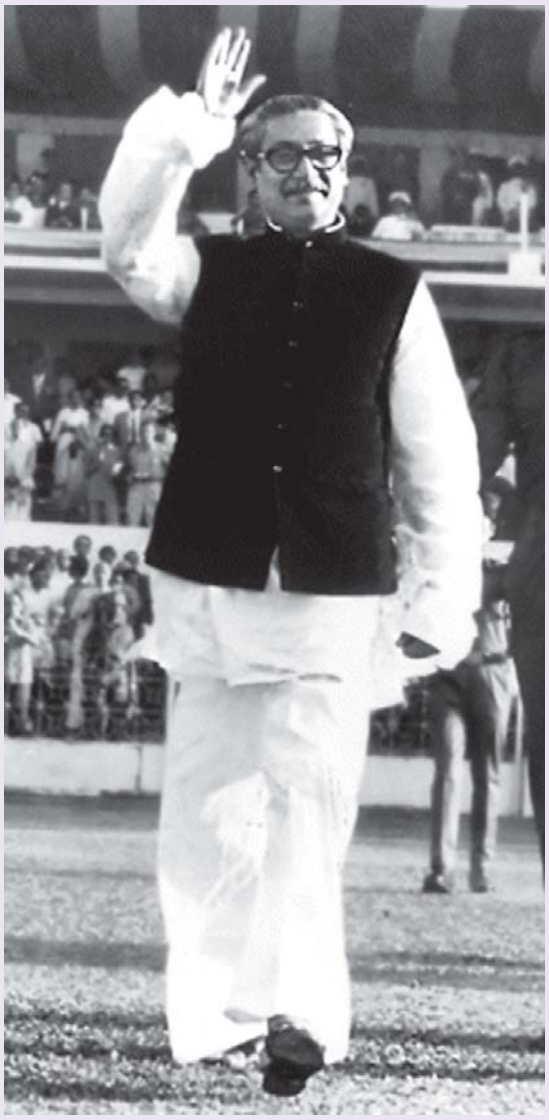

## আমার সুপার হিরো

# আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

## এইচ. এম. সা'আদ

আমি একজন সুপার হিরোকে নিয়ে ভাবি। তিনি একজন নেতা। যাকে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ-ই চেনে ও জানে। তিনি হলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

একজন সুপার হিরো যেমন সবাইকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন তেমনি তিনিও একজন নেতা যিনি বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি শাসকদের

হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ জন্য তিনি একজন সুপার হিরোর মতো ব্যক্তি।

তিনি বাংলার মানুষের জন্য অনেক ত্যাগ করেছেন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে বাঙালি জাতির জীবনকে রক্ষা করেছেন। কোথাও কোনো প্রকার অন্যায়, অবিচার দেখলে রুখে দিয়েছেন। দুঃস্থদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এ কারণেই তিনি পেয়েছেন বিশ্বের ও বাংলার মানুষের অপূরণীয় ভালোবাসা। এজন্য তাঁকে বিশ্বের বা বাংলার সকল মানুষের প্রাণ প্রিয় ব্যক্তি বলা হয়।

তিনি গরিব মানুষের জন্য ঘর দিয়েছেন। তাদের আবাসস্থল তৈরি করেছেন। এজন্য তাঁকে বহুবার নানাভাবে কষ্ট পেতে হয়েছে। যখন বহির্বিশ্ব বাংলাদেশকে এবং বাংলার মানুষকে শাসন করতে চেয়েছিল তখন তিনি নিজেই এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন।

৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতিকে সংগ্রাম করে স্ব অধিকার আদায়ের পথ দেখিয়েছেন। তিনি বাঙালি জাতির অন্তরে চির অম্লান হয়ে বেঁচে থাকবেন।

একজন সুপার হিরো এমন করেই সকল মানুষের পাশে দাঁড়ান। সকলকে সাহায্য করেন। এসব কারণে তাঁকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল কিন্তু এর পরও তিনি থেমে থাকেননি, হয়ে ওঠেন সকলের নেতা ও মধ্যমণি। তেমনি বঙ্গবন্ধুও একজন সুপার হিরোর ন্যায়। এজন্য আমি তাঁকে সুপার হিরো বলি।

*৮ম শ্রেণি, নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নড়াইল*

# আমার সুপার হিরো উড়তে শেখায়

**সামিহা তাসনিম সিনহা**

প্রতিটি মানুষের জীবনেই এমন কেউ একজন থাকে যাকে মানুষ অনুসরণ করে। আদর্শ বলে মনে করে। অনেকে আবার কোনো একজনকে অনুসরণ না করে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে ধারণ করতে চেষ্টা করে। আমি অবশ্য প্রথম দলেরই সদস্য। আমার মনে হয় প্রতিটি মানুষের মধ্যে কিছু ভালো কিছু খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকে। আশপাশের মানুষদের থেকে ভালো গুণগুলো আমরা আত্মস্থ করতেই পারি। আমরা পুরোপুরি হয়ত আদর্শ ব্যক্তির মতো হতে পারি না, তবে তাদের জীবনকে সামনে রেখে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারি।

আমার চোখে কে সুপার হিরো! কথাটি শোনার পর যার চেহারা মনের কোণে ভেসে ওঠে সে আমার আম্মু। আমার মনে হয়– স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যানদের যেমন সুপার পাওয়ার আছে আম্মুরও তেমন আছে।

আমার যখন বোঝার বয়স হয়েছে তখন থেকেই দেখেছি, কোনো কিছু আম্মুর নজর এড়ায় না। আমাদের কিছু প্রয়োজন হলে চাওয়ার আগেই আম্মু বুঝে যান এবং তা এনে হাজির করেন। আবার কখনো কোনো বিব্রতকর অবস্থায় পড়লে মুখ দেখেই যেন আম্মু বুঝে যান। তা শুনে আমাদের সুন্দর সমাধানও দিয়ে দেন। আর মনের কথা বের করে আনার ওস্তাদ। আমাদের দুই বোনের প্রিয় বন্ধু আমার আম্মু। সব কথা আমরা আম্মুর সাথে শেয়ার করি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বা রাতে খাওয়ার টেবিলে আম্মু, আমি আর আমার ছোটো বোন সারাদিনের অভিজ্ঞতার একটা ছোটোখাটো বর্ণনা দিই। সেখানে কার কী ঠিক কী ঠিক নয়, কোনটা করলে বিষয়টা আরো সহজ হতো, ভবিষ্যতে কী করা উচিত তা নিয়ে আলোচনা হয়। এটা অবশ্য আম্মুরই আইডিয়া। এর মাধ্যমেই আমি অনেক মানুষকে চিনেছি। কোন পরিস্থিতিতে কী আচরণ করা উচিত তা শিখেছি। কখনো যদি ভাবি যে, এই কথাটা আম্মুকে বলব না, কিন্তু অফিস থেকে

ফিরে আমাদের নাশতা দিয়ে কেমন করে যে গল্প শুরু করেন, তখন আমরা দুই বোন সব বলে দিই। ভালো সমাধানও পাই। স্কুলে বন্ধুদের সাথে ঝামেলা হচ্ছে, আম্মুর দেওয়া সমাধান টনিকের মতো কাজ করে।

আম্মু সবসময় বলেন, জীবনকে যত সরলভাবে ভাবা যায় ততই সহজ। আর সততাকে মূল হাতিয়ার হিসেবে মানে আম্মু। বলেন, সৎভাবে চললে কোনো বিপদ হয় না। মিথ্যা বিপদ ডেকে আনে।

এই মন্ত্রকে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আম্মুকে কখনো বিপদে ভেঙে পড়তে দেখিনি। যে-কোনো জটিল সমস্যাকে আম্মু সহজভাবে চিন্তা করে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখে এবং শেষে দেখা যায়, খুব সহজেই সমাধানও বের হয়ে এসেছে।

আম্মুর দূরদর্শিতা অসাধারণ। আম্মুর কাছ থেকে ইতিবাচক শিক্ষা পেয়েছি। কীভাবে সত্যকে বিনয়ের সাথে উপস্থাপন করা যায় তা আম্মুকে না দেখলে হয়ত অজানাই থাকত। এসবের মধ্য দিয়ে কখন যে আমার মনের সুপার হিরোর জায়গাটায় আম্মুর রাজত্ব শুরু হয়েছে বুঝতেই পারিনি। আজ 'নবারুণ' পত্রিকায় সুপার হিরো সম্পর্কে লেখার বিজ্ঞাপন দেখে লেখার লোভ সামলাতে পারলাম না।

এমন কোনো দিনের কথা মনে পড়ে না, যেখানে আমার মন খারাপ অথচ আম্মুকে পাশে পাইনি। আবৃত্তির হাতেখড়ি, সাহিত্যকে ভালোবাসা এসব আম্মুরই অবদান।

অন্যান্য সুপার হিরোদের মতো আম্মু হয়ত উড়তে পারে না, তবে আমাদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে সাহায্য করে এবং আমাদেরকে ওড়ার অনুপ্রেরণা আম্মু প্রতিনিয়ত দিয়ে যাচ্ছেন।

*দশম শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ*

# আমার প্রকৃত সুপার হিরো

## রুকাইয়া তাবাস্‌সুম রুপু

সবার জীবনে অনেক সুপার হিরো আসে। কিন্তু সকলেই তো প্রকৃত সুপার হিরো নাও হতে পারে। কিন্তু আমার জীবনের যে সুপার হিরো সম্পর্কে আমি বলব সে আসলেই প্রকৃত সুপার হিরো।

কে সেই সুপার হিরো সেটা না হয় পরে বলি আগে বলি কেন সুপার হিরো।

সে সুপার হিরো কারণ তার প্রতিটি কাজ আমার জীবনে চলার পথে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে অনুপ্রেরণা যোগায়। আমি বড়ো হয়ে তার মতোই হতে চাই। সে একজন সৎ, সময় জ্ঞানসম্পূর্ণ, চরিত্রবান ও মজার মানুষ। আমি যখন কোনো ভুল কাজ করে ফেলি বা অন্যায় করি তখন সে আমাকে সংশোধন করতে সাহায্য করে এবং বলে যার সাথে অন্যায় করেছি তাকে sorry বলতে।

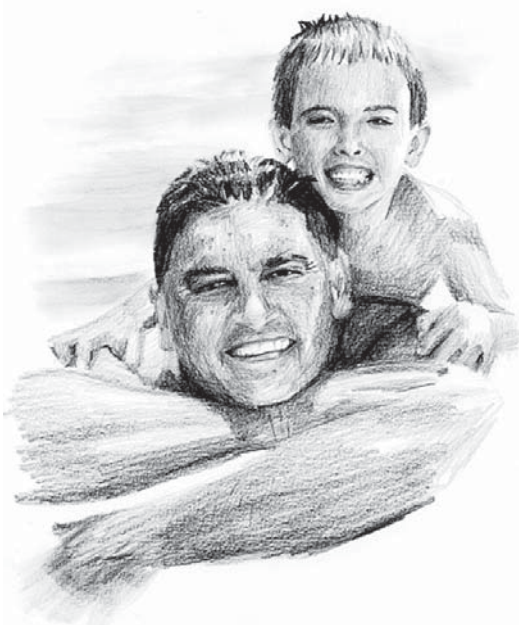

ছুটির দিনে সকালে যখন দেরি করে উঠি তখন উঠে দেখি সে দৈনিক যেমন ভোরে উঠে সালাত আদায় করে তারপর বাকি কাজ করে, ছুটির দিনেও সে ঠিক তেমনটাই করেন। এটা দেখে আমিও ছুটির দিনে তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করি।

তার সব কিছুই আমাকে ভালো মানুষ হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি আমার জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও ভালো মানুষ। একজন ভালো মানুষই তো প্রকৃত সুপার হিরো। এখন বলি যার সম্পর্কে এত কিছু বললাম সে ব্যক্তিটি আসলে কে। সে ব্যক্তিটি আমার বাবা। শুধু বাবা নয় আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আমার সুপার হিরো। বড়ো হয়ে আমি তার মতো হতে চাই। ■

*সপ্তম শ্রেণি, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট।*

**কেউ চাইলেই সুপার হিরো হতে পারবে, কিন্তু চাইলেই মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব নয়। বীর মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সত্যিকারের প্রেরণা। সুপার হিরোর মতো দেশকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, নিরাপদ করেছেন আমাদের ভবিষ্যৎ। আর তাই সত্যিকারের সুপার হিরোদের স্মরণ করি চল।**

### বীরপ্রতিক খেতাব পাওয়া

# ছোট্ট মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী গল্প

**আশিক মুস্তাফা**

এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে আমাদের মইজদীপুর গ্রামের এক কিশোর চলে যায় মুক্তিযুদ্ধে। ভারতের ত্রিপুরা জেলার উদয়পুরের পালাটানা ক্যাম্পে টানা ২১ দিন ট্রেনিং শেষে কিশোর আব্দুল হক যুদ্ধে নামে। তার কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম। আমাদের মইজদীপুর গ্রামের কিশোর যোদ্ধা আব্দুল হকের চেয়েও কম বয়সি শিশু-কিশোররা মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে গিয়ে অনেকে শহিদ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়া প্রায় চার লাখই ছিল শিশু-কিশোর। সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্ট্যাডিজের চেয়ারম্যান ও প্রধান গবেষক মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভুঁইয়া বীরপ্রতীকের মতে, 'মুক্তিযুদ্ধের ৭৮ হাজার গণযোদ্ধার প্রায় ২৩ শতাংশ ছিল শিশু-কিশোর।' যেসব শিশু কিশোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধ করেছে তারমধ্যে বীরপ্রতীক খেতাব পাওয়া এমন ১১ জন শিশু-কিশোর মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে পরিচিত হই চলো–

### তারা নামের ছোট্ট মেয়েটি

মায়ের কাছ থেকে মেয়েটা জেনেছে কারা মানুষের ঘর

আগুনে পুড়িয়ে দেয়, রাতবিরাত ঠ্যার‍্যা-র‍্যা-র‍্যা গুলি করে। জানাশোনার পর ছোট্ট মেয়েটার সাহস বেড়ে যায়। একদিন মাকে বলে, 'মা আমি যুদ্ধে যাবো।' মা চুপ করে থাকেন। এক সকালে বাড়ির পাশের জঙ্গলে কচুরমুখী তুলছিল মেয়েটা। হঠাৎ বড়ো মানুষের কণ্ঠ।

ভয় পাওয়ার কথা হলেও মেয়েটা ভয় পায় না। তার বুক ভরা যে সাহস। সে যে মনের ভেতর যুদ্ধ পুষছে। বড়ো মানুষটা কাছাকাছি এসে মেয়েটার চোখে তাকিয়ে বলে, 'তুমি ভাত রান্না করতে পারো? পারলে চলো মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে।' ছোট্ট মেয়েটার বুকটা তখন গর্বে ফুলে উঠে। লোকটাকে নিয়ে যায় মায়ের কাছে। মায়ের অনুমতি নিয়ে প্রথমে ক্যাম্পে রান্না। পরে শুরু করে যুদ্ধ। ক্যাম্পের পাশের নদী সাঁতরে গিয়ে জেনে আসত শত্রুদের অবস্থান। তারপর প্রস্তুতি নিত তারামনের দলের মুক্তিযোদ্ধারা। কখনো সে কলাগাছের ভেলায় পাড়ি দিত ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী সোনাভরি। তার সাহস দেখে যে কেউ চমকে যেত। যেই কাজের সাহস পেত না বড়োরা সেই কাজ অনায়াসেই করে ফেলতো ছোট্ট তারামন। *বীরপ্রতিক তারামন বিবিকে হারিয়েছি আমরা ১লা ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে। তাঁর উজ্জ্বল স্মৃতির প্রতি রইল সশ্রদ্ধ সালাম।*

### সাহসী সালেক

ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া ভালো ছেলেটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। বাবার লেজে লেজে ঘোরা ছেলেটার বাবাকে মেরে ফেলে পাকিস্তানিরা। ফলে খ্যাপে ওঠে সে। চলে যায় যুদ্ধে। কাঁধে বন্দুক নিয়ে অপারেশনে বের হয়। একের পর এক আক্রমণ চালায় বড়োদের সঙ্গে। ২২শে নভেম্বর চন্ডীবাজার সংলগ্ন খাতাপাড়া গ্রামে এক অপারেশনে আবু সালেক শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত শেল থেকে ছুটে আসা টুকরোর আঘাতে আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে গৌহাটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে আসে সালেক। ততদিনে দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। স্বাধীন দেশে বুক ফুলিয়ে ঢুকে ছোট্ট বীর সালেক। তাকে দেখে সবাই রাস্তা ছেড়ে দেয়। সে বড়ো করে নিশ্বাস নেয়। বাবার কবর জিয়ারত করে। বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'তোমার দেশ স্বাধীন করেই দেশে ফিরেছি বাবা। মেরে এসেছি শত্রুদের। এবার তুমি শান্তিতে ঘুমাও বাবা।' অনেকেই বলেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া যোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে এই পিচ্চি সালেক!

### অপারেশন কুপতলা ব্রিজ

একটু পরেই ভোর হবে। চারদিক ফরসা হয়ে আসছে। কমান্ডার আমিনুর রহমান তালুকদার পিচ্চি হাবিবকে ডেকে বললেন, 'খুব সাবধানে গিয়ে বারুদের তারে আগুন ধরিয়ে দিয়েই চলে আসবি; সাবধানে কিন্তু!'

কমান্ডারের কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে কাজটা ভয়ংকর। তবু একটুও ভয় পায় না ছোট্টমোট্ট হাবিব। তার শুধু বুকে নয়; শরীর জুড়েই সাহস! কোমরটা গামছা দিয়ে একটু শক্ত করে বেঁধে নেয় হাবিব। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। কোমরের গামছায় লুকিয়ে রাখা ম্যাচ বের করে। উড়িয়ে দেয় কুপতলা ব্রিজ। এর ভেতর হাবিবের ডাক পড়ে টাঙ্গাইল আর জামালপুরে। কুপতলা ব্রিজের পর সে একে একে টাঙ্গাইল-জামালপুর সড়কের বিভিন্ন ব্রিজ গুঁড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। পাকিস্তানিদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। আর ছোট্ট হাবিবের ছিল শুধুই সাহস। বুকভরা সাহস নিয়ে হাবিব ফের কাজে নামে। এক এক করে গাইবান্ধা সদরে অবস্থিত কুপতলা রেলওয়ে ব্রিজের মতো সব ব্রিজ গুঁড়িয়ে দেয়।

### বিচ্ছু লালুর ছোট বন্দুক

গ্রামের ছেলে লালু যোগ দেয় যুদ্ধে। মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য এনে দেয় সে। লালুর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে ১৯৭১ সালের ৭ই অক্টোবর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা হামলা চালায় গোপালপুর থানার পাকবাহিনীর ক্যাম্পে। এর ভেতর লালু লুকিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প থেকে তিনটি গ্রেনেড নিয়ে হাজির হয় পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে। পুরো পুলিশ স্টেশন চক্কর মেরে ছোট্ট লালু তার বুদ্ধি দিয়ে টার্গেট ঠিক করে। তারপর চুপিচুপি গ্রেনেড বের করে। ব্যাংকারে ছুঁড়ে মারে। এই গ্রেনেড

বিস্ফোরিত হওয়ার পরেই পাকিস্তানিরা ভয় পেয়ে যায়। অন্য ব্যাংকারে থাকা সৈন্যরা আন্দাজে গুলি ছুঁড়তে থাকে। সাহসী লালু অবস্থা বেগতিক দেখে শুয়ে পড়ে। শোয়া থেকেই গ্রেনেড ছুঁড়ে। সশব্দে বিস্ফোরিত হয় সেটা। এবার আর ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস পায় না পাকবাহিনী। তারা ভাবতেই পারেনি যে ছোট্ট লালু এমন দুঃসাহসিক হামলা চালিয়ে বসবে তাদের উপর। লালুর এই হামলায় পর ভয়ে পাকিস্তানিরা গোপালপুর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

### গুলি করে বিমান ধ্বংসালো পিচ্চি ইসমাইল

মুক্তিযোদ্ধাদের হাইড-আউটের এত কাছ দিয়ে বিমানটি উড়ে গেল যে, তারা সবাই দেখতে পেলেন- বিমানের গায়ে লেখা ১৩০। বিমানটি কয়েক চক্কর দিয়ে ধীরে ধীরে অবতরণ করছে। চাকাগুলো নেমে পড়ে বিমানের গা থেকে। তারপর ধীরে ধীরে নামছে বিমান। বিমানটি দেখে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইলের মাথায় গুলি করে বিমানটা ফেলে দেওয়ার বুদ্ধি আসে। ছুটে গেল কমান্ডারের কাছে। কমান্ডার পরিকল্পনা করে বিমানে গুলি চালায়। গুলি খাওয়া বিমানটি আকাশে উড়লেও ভালোই ধকলে পড়ে। এতেই শেষ নয়; বিমানটি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ঢাকায় অবতরণ করতে গিয়েই বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

এর দু'দিন পর আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয় বিধ্বস্ত বিমানের খবর। জয় বাংলা পত্রিকায়ও বিমানবিধ্বংসী মুক্তিযোদ্ধাদের নামের সঙ্গে ছাপা হয় কিশোর ইসমাইলের নাম। ১২ বছর বয়সি কিশোর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল ক্যাম্পে বসে বিমান ধ্বংসের খবর শোনে আর বুক ফুলিয়ে হাসে। ভাবে, এভাবেই দেশটাকে স্বাধীন করে ফেলবো বড়োদের সঙ্গে।

### বিদেশি দুতাবাসে গ্রেনেড ছোঁড়া ছেলেটি

তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছিই ছিল ভাটারা থানা। এই ভাটারাতেই ছিল দুঃসাহসী ছেলেটার বাড়ি। সেসময় ঢাকার বাড্ডা, ভাটারা, ছোলমাইদ ছিল পুরোপুরি গ্রাম। মাইলের পর মাইল ধানের ক্ষেত, খাল-বিল-জলাশয়। এসব ঘিরেই বেড়ে উঠেছিল দুঃসাহসী ছেলেটা। মোজাম্মেল নামের সেই ছোট্টমোট্ট সাহসী ছেলেটার বাবা-চাচারা ছিলেন কৃষক। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি বাড়ি হওয়ায় যুদ্ধের আগেই তারা পাকিস্তানি সেনাদের অনেক অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছিল। দিনরাত সেনাবাহিনী অত্যাচার করতো সাধারণ মানুষের উপর। এসব দেখে সে প্রতিশোধের প্রহর গুনতে থাকে। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বাড়ির আশপাশের বড়োদের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। বাড়ি থেকে পালিয়ে ট্রেনিং করে আসে। সেখান থেকে ফিরে ক্যাপ্টেনের অনুমতিতে ছোট্ট মোজাম্মেলসহ তার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গ্রুপ দায়িত্ব পায় গভর্নর মোনায়েম খানের বাড়িতে অপারেশন চালানোর। মোনায়েম খান তখন তার ড্রইংরুমে। রুমটা খোলাই ছিল। তারা ঢুকেই দেখে সোফায় বসে আছে শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হোসেন এবং মোনায়েম খানের মেয়ের জামাই জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল। আর এই দুই জনের মাঝখানে মোনায়েম খান। তাদের কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মোজাম্মেলরা ইন্ডিয়ান স্টেনগানে ফায়ার শুরু করে।

### ঢাকার রাস্তায় বিচ্ছু জালালের ব্যারিকেড

পিচ্চিটা অষ্টম শ্রেণি পাস করে মাত্র নবম শ্রেণিতে উঠলো। এইটুকুন বয়সেই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যোগ দেয় ২ নম্বর সেক্টরে। সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ ডানপিটে জালালকে দেখেই বুঝতে পারেন যে, একে দিয়েই হবে। তাই খুব আদর করতেন পিচ্চিটাকে। কাছে কাছে রাখতেন। আদর করে ডাকতেন 'বিচ্ছু জালাল' বলে। একাত্তরের যেই কাল রাতে পাকিস্তানিরা ঘটিয়েছিল ইতিহাসের নির্মম গণহত্যা। সেই রাতে মানে ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের কিছুক্ষণ আগে দুঃসাহসী জালাল তার ভাই ফরিদউদ্দিন আহমেদ মঞ্জু ও ইসরাত উদ্দিন আহমেদ বাবুলসহ ৩০০ থেকে ৪০০ সঙ্গী নিয়ে কাঠের গুঁড়ি, ভ্যানগাড়ি, বাঁশ, পরিত্যক্ত গাড়ি, ড্রাম দিয়ে বাংলামোটরের সামনের রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে দেয়। জালালের সাহস দেখে তার বাবা পুলিশ সুপারও ভয় পেয়ে যান। শুধু ডরভয় নেই এইটুকুন একটা ছেলের।

### কুড়িয়ে পাওয়া মা

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই আরেক যুদ্ধ শুরু করে দিল বাকী। তখনো সে হাই স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি। এইটুকুন পিচ্চি এক সকালে ক্লাসে দাঁড়িয়ে টিচারকে বলে, 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি নামের বই পড়বো না। এই বই থাকতে পারবে না আমাদের পাঠ্যতালিকায়।' কিছুদিন পরই দেশে শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ। বাকীও শত্রু

মোকাবেলার জন্য তৈরি। ধাপে ধাপে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে থাকে।

একদিন অপারেশনে গিয়ে আহত হয়ে নৌকায় করে চলে যায় চারগাছ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের এক গ্রামে। অচেনা গ্রাম। তবে ছোটো বাকীর ধারণা, ঐ গ্রামটির নাম ছিল শিকারপুর। এই শিকারপুরে গিয়ে বাকী আশ্রয় খোঁজে।

ছোট্টমোট্ট মুক্তিযোদ্ধাকে দেখে এক মা তাকে ঘরে তুলে নেন। নিজের সন্তানের মতো বাকীর দেখা শোনা করতে থাকেন। ছোট্ট মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লাহ-হিল-বাকীকে আঁচলে আগলে রেখেছিলেন অচেনা এই মা।

### দেশ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে যেই যোদ্ধা

মা ভেলুয়া বিবি কী করে বুকের ধনটাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। ছেলেটার বাবাসহ অন্য তিন ছেলেও যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন যুদ্ধে। বুকের ছোট্ট ধনটাও যদি চলে যায় তো মা কি নিয়ে থাকবেন ঘরে। চুল কাটার কথা বলে মায়ের কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে কাউকে না জানিয়ে যুদ্ধের পথে হাঁটা ধরে আবু জাহিদ।

ট্রেনিং শেষে তার দল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলার কসবা উপজেলার চারগাছ বাজারে। পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি ঝটিকা অপারেশন চালায়। নয়জন মুক্তিযোদ্ধার এক বহর নৌপথে ওই অপারেশনে রওনা হয়। দলের সবচেয়ে ছোট্টমোট্ট যোদ্ধাটি গুলিবিদ্ধ হয় সেদিন। গুলিবিদ্ধ শরীরে সে নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না আর। দেশ স্বাধীন করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ছোট্ট যোদ্ধাটি গুলির ধকল সামলে উঠতে পারেনি। ছোট্ট শহিদ মুক্তিযোদ্ধা আবু জাহিদ দেশকে বুকে নিয়ে চারগাছ উচ্চ বিদ্যালয় এলাকায় শুয়ে আছেন। কখনও কুমিল্লায় গেলে ছোট্ট যোদ্ধাকে স্যালুট জানিয়ে এসো।

### মামুন সরকারের দুঃসাহসী অভিযান

মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট্ট একটা দল নিয়ে শহর-বন্দর-গ্রাম, হাট-বাজার, অফিস-আদালত চারদিকে কানাঘুষা, ফিসফাস। বলে, 'শুনছ! মুক্তি আয়ছে। ছোটহরণের রেলব্রিজ উড়াইয়া ফেলাইছে। ব্রিজের ছিন্নভিন্নও নাই।' তাদের ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার খবর ১৯৭১ সালের ২১শে আগস্টের চরমপত্রে রসাত্মক ভাষায় তুলে ধরেন এম আর আখতার মুকুল। এর আগের দিন মানে ২০শে আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও ছোটহরণের রেল সেতু উড়িয়ে দেওয়ার সংবাদ প্রচার হয়। যে রেল সেতু উড়িয়ে দেওয়ার মূল নায়ক ছিলেন এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। ছোট্টমোট্ট সেই সাহসী যোদ্ধার নাম-আল মামুন সরকার। একাত্তরে মামুন দশম শ্রেণিতে পড়তেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে।

### হাঁটুতে সেল নিয়ে যুদ্ধ করে ছোট্ট কমান্ডার রফিকুল

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার ভাটেরচর গ্রাম। এই গ্রামের আবদুল আলী ও ফরিদা খাতুনের ছেলে রফিক। ছোট্ট এই ছেলেটা স্কুল ছেড়ে চলে যায় যুদ্ধে। নিজ গ্রাম মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার মধ্য ভাটেরচরে একটি সেতু ধ্বংস করতে গিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিক্ষিপ্ত সেলে আহত হয় ছোট্ট যোদ্ধা রফিকুল। সহযোদ্ধারা তাকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়। ভর্তি করায় হাসপাতালে। একদিন ঠিকই সুস্থ হয়ে উঠে রফিকুল। নতুন প্রশিক্ষণ নিয়ে ফের নামে যুদ্ধে। যদিও তার হাঁটুতে থেকে যায় সেলের ক্ষত। এরপর মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী, গজারিয়া, কুমিল্লার দাউদকান্দি, হোমনা, দেবিদ্বার, পানতি, পাহাড়পুর, কোনাবন এবং ঢাকার মাতুয়াইলে গেরিলাযুদ্ধ করেছেন। ■

## বিজয়

সাদাত শায়েব

বছর ঘুরে এসেছিল
সেই বিজয়ের দিন,
শহিদ ভাইয়ের রক্তে রাঙা
লাল-সবুজের ঋণ।
সেই বিজয়ের দিন।
বিজয়ের রঙে রাঙিয়ে দেশ
ভালোবাসার বাংলাদেশ
এগিয়ে যাবে দিন
তা ধিন ধিন ধিন।

ষষ্ঠ শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

# সীমা সরকার
# একজন সুপার হিরো

বিনয় দত্ত

*হৃদয়কে কোলে নিয়ে মা সীমা সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছেন*

সুপার হিরো। শব্দটার সাথে আমরা কমবেশি সকলেই পরিচিত। যারা পরিচিত নয় তাদের জন্য বলছি, সুপার হিরো হচ্ছে এমন কিছু চরিত্র, যে চরিত্রগুলো আসলে সাধারণ কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়। বরং অসাধারণই বলা চলে। এই চরিত্রগুলো পেশী শক্তি, মেধা এবং বুদ্ধির জোরে যেকোনো দুর্ঘটনা বা অঘটন ঠেকাতে সক্ষম। আরো সহজভাবে বলতে গেলে, সাধারণ মানুষ যা করতে পারে না, সুপার হিরোরা তা সহজেই সমাধা করে দেয়। চরিত্রগুলোকে আমরা বাস্তবে দেখি না। তাদের কমিকস্ বই বা কার্টুন বা সিনেমার পর্দায় দেখা মেলে।

তবে ছেলেবেলায় এইসব কমিকস্ বই পড়ে কারো মনে সুপার হিরো হওয়ার সাধ জাগেনি এমনটা পাওয়া যায়নি বললেই চলে। তখন এমন হতো, কমিকস্ পড়ে আমরা নিজেদের কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়াতাম। সুপার হিরোর মতো আচরণ করতাম, তার মতো ঘুরে বেড়ানোর চেষ্টা করতাম। এমনকি সমাজের কোনো অসঙ্গতি দেখলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করার চেষ্টাও করতাম। এইসব স্মৃতি আমাকে এখনো তাড়িত করে।

তবে কল্পনার সুপার হিরোদের বাইরেও যে সত্যিকারের সুপার হিরো আছে এবং আমাদের মাঝে ঘোরাঘুরি করছে তার নমুনা আজকে দিবো। সেই সুপার হিরোর নাম সীমা সরকার। তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি একজন মা, তিনি হৃদয় সরকারের মা।

হৃদয় সরকার আর সাধারণ মানুষের মতো নয়। সে বিশেষ মানুষ বা স্পেশাল চাইল্ড। হৃদয়ের দুই পায়ে হেঁটে বেড়ানোর মতো শক্তি নেই। সে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো হাঁটাচলা করতে পারে না। এই সমস্যা আজকের নয়, তা একদম জন্ম থেকেই। কীভাবে, বলছি তোমাদের।

২০০০ সালের ২৩শে অক্টোবর নেত্রকোনার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে সমীরণ সরকার এবং সীমা সরকারের কোল আলোকিত করে এসেছিল ছোট্ট হৃদয়। জন্মের দুই ঘণ্টা পরও হৃদয়ের কান্না না দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। অক্সিজেন দেওয়া হলো। পরবর্তীতে জানা যায়, যেই অক্সিজেন হৃদয়কে দেয়া হয়েছিল তার মেয়াদ ছিল না।

একসময় হৃদয়কে নিয়ে বাড়ি এলেন তার পরিবার। ধীরে ধীরে হৃদয় বড়ো হতে লাগল। সে অন্য বাচ্চাদের মতো চলাফেরা করতে পারতো না। চিকিৎসকদের কাছ থেকে জানা গেল, জন্মের সময় মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ায় হাত-পায়ে সে শক্তি পাবে না। কথা বলতে বা লোকজন চিনতেও সমস্যা হতে পারে। এ সমস্যা দীর্ঘদিন চলতে পারে, হয়ত সারা জীবন ধরে এই সমস্যা বয়ে বেড়াতে হবে।

এই কথা শুনে সীমা নিজেকে দমলেন না বরং আরো বেশি বেগে ছেলেকে স্বাভাবিক করতে উঠে পড়ে লাগলেন। ডাক্তারের দেয়া ওষুধের পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়ামও চালিয়ে গেলেন। তিন বছর বয়সে হৃদয় বসা শুরু করল। ধীরে ধীরে দাঁড়াতে লাগল। ঘর থেকে উঠান পর্যন্ত একটা বাঁশ বেঁধে দিলেন। সেই বাঁশ ধরে হৃদয় হাঁটতে থাকে, তাও পুরোপুরি পেরে উঠে না।

হৃদয়কে স্কুলে ভর্তি করানো হলো। বাসা থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে সেই স্কুল। সার্বক্ষণিক সঙ্গী সীমা সরকার। হৃদয়কে কোলে নিয়ে বড়ো রাস্তায় হেঁটে যেতেন। পরের রাস্তাটুকু রিকশা নিতেন। কখনো কখনো হৃদয়ের ক্লাশ পড়তো তিনতলা বা চারতলায়। সীমা কোলে করে হৃদয়কে নিয়ে যেতেন। ক্লাসে বসিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতেন। এই সময়টাই সীমা সরকারের ধৈর্যচ্যুতি হওয়াটা একদমই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু হয়নি। স্কুলে অন্যান্য অভিভাবকরা বলতেন, এইভাবে আর কতদিন কষ্ট করবেন। এইসব কথার প্রতিত্তোরেও সীমা কিছু বলতেন না শুধু মনে মনে নিজের মনোবলকে শক্ত করতেন। বার বার সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতেন তিনি যেন হৃদয়কে নিয়ে আরো অনেক দূরে যেতে পারেন।

**সম্প্রতি সীমা সরকার বিবিসির করা বিশ্বের বিভিন্ন অঙ্গনের ১০০ জন অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাববিস্তারী নারীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। প্রতিবছর সারা বিশ্বের বিজ্ঞান, রাজনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য, বিনোদন, সাংবাদিকতাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঙ্গনের ১০০ জন অনুপ্রেরণাদায়ী নারীর তালিকা প্রকাশ করে বিবিসি। সেই তালিকায় ৮১তম স্থানে রয়েছেন আমাদের সীমা সরকার, বাংলাদেশের সীমা সরকার, হৃদয়ের সুপারহিরো সীমা সরকার। বিশ্বের ৬০টি দেশের ১৫ থেকে ৯৪ বছর বয়সী বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী নারীদের মধ্যে মমতাময়ী মা হিসেবে সীমা নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।**

এইভাবে যুদ্ধ করে সীমা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে উঠল। আবু আব্বাস ডিগ্রি কলেজেও সীমা ছেলেকে নিয়ে এগিয়ে চলা অব্যাহত রাখল। জিপিএ ৪.৫০ পেয়ে হৃদয় এইচএসসি পাস করল। এইবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতি। এ কীভাবে সম্ভব? সীমা হৃদয়কে প্রতিনিয়ত চোখে চোখে রাখলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতিতে সীমা পাশে পাশেই থাকলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে হৃদয়ও পরীক্ষা দিয়েছে। ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার জন্য সীমা ছেলেকে নিয়ে ঢাকা আসেন। শ্যামলীতে এক আত্মীয়ের বাসায় উঠলেন। পরীক্ষার দিন যথারীতি সীমা হৃদয়কে নিয়ে হাজির হন কলাভবনের পাঁচতলায়। ছেলেকে পরীক্ষার হলে বসিয়ে দিয়ে বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলেন সীমা। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার পর হৃদয় রেজাল্ট দেখে উচ্ছ্বাসে কেঁদে ফেলে। সীমার তীব্র কষ্ট সার্থক হলো হৃদয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করা দেখে। পরবর্তীতে প্রতিবন্ধী কোটায় হৃদয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

হৃদয়ের সুপার হিরো হৃদয়ের মা। হৃদয়ের বাবার অল্প আয়। ইট ভাটায় কাজ করে যা পান তা দিয়ে তাদের সংসার চলে যায়। হৃদয় ছাড়াও অন্তর নামে তাদের আরেকটি সন্তান আছে। অন্তর ক্লাস সেভেনে পড়ছে। সীমা সরকার যদি তখন হাল ছেড়ে দিতেন তবে হৃদয়ের আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা হতো না, ভর্তি হওয়া হতো না, হয়ত পড়াও হতো না। এ সবই সম্ভব হয়েছে সীমা সরকারের কারণে।

সুপার হিরো মা সীমা সরকারকে জানাই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। ■

# আমার সুপার হিরো 'বুবু'

**রেজানুল হক রাফি**

একজন সুপার হিরো কি সবার সমস্যা সমাধান করতে পারে? উঁহু! তা কীভাবে সম্ভব! যাকে সাহায্য করে, তার কাছেই সে একজন সুপার হিরো।

সুপার পাওয়ার? সেটা তো থাকেই; কিন্তু সে টা নিশ্চয় উড়তে পারা, খাড়া দেয়াল বাইতে পারা, চোখ দিয়ে লেজার রশ্মি বের করাটা শুধু না। পাওয়ারটা তো মনের জোরও হতে পারে।

নিজে নিজে নিজের সমস্যা সমাধান? মাঝে মাঝে অন্যের সাহায্য হয়ত লাগে, কিন্তু বেশীরভাগ সময়ই নিজে নিজেই সমাধান করে।

আমার কাছে আমার সুপার হিরো যে, এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই তার আছে। আর আমার সুপার হিরো? সে আমার বুবু। জানি, আজকালকার যুগে বড়ো বোনকে বুবু ডাকার চল নেই। সবাই আপু, আপ্পি বা সিস বলে ডাকে। আমি অবশ্য এই আদ্যিকালের ডাকেই ঠিক আছি। আর সুপার হিরোর নামে কি-ই বা এসে যায়? তার কাজটাই তো আসল।

আমার বুবু, যে একা একাই নিজের সমস্যার সমাধান করে। সে নিজেই হাজারো সমস্যার সাথে লড়ে আমাকে যেমন আমার বয়োসন্ধির পুরো সময়টায় সাহায্য করে গেছে দ্বিধা না করে আমার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করেছে। বাসা থেকে অনেকটা দূরের স্টেডিয়ামে গ্রামের একটা মেয়ে হয়েও যাওয়া-আসা করেছে কারাতে ব্ল্যাক বেল্টও অর্জন করেছে। গ্রামে বড়ো হয়েও স্বপ্ন ছাড়তে শেখেনি - আমাকেও ছাড়তে দেয়নি।

আমি একাদশ শ্রেণির ছাত্র, তবে আমার বয়সের আর দশটা ছেলেমেয়ের মতো ইন্টারনেটের সাথে আমার তেমন যোগাযোগ নেই। বুবুই এই লিখার কথা আমাকে জানায়; তাই আমি এসব ব্যাপারে জানতে পারি।

আর এসবের জন্যই বুবু - আমার সুপার হিরো।

*একাদশ শ্রেণি, সরকারি গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ*

# সুপার হিরো 'দাদা'

**ইসরাত ফারাবী**

ছোটোবেলা থেকেই অনেকে আমার ভবিষ্যতের জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তার মাঝে একজন হলেন আমার বড়ো ভাই সৈকত দাদা।

আমরা তিন ভাইবোন, সৈকত দাদা বড়ো তারপর শান্ত দাদা আর আমি সবার ছোটো। শান্ত দাদা স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পড়তে গেছে, আর সৈকত দাদা একটি

*তাহসিনা তাবাসসুম জুহানা, দশম শ্রেণি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা*

বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত আছে। সৈকত দাদার মাঝে সবসময় বড়োদের মতো একটা কর্তব্যপরায়ণতা ও দায়িত্ববোধ কাজ করে।

বড়ো ছেলে হিসেবে দাদাকে ছোটোবেলা থেকেই অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। যেহেতু দাদাকে পথ দেখানোর তেমন কেউ ছিল না, তাই দাদা নিজেই ভবিষ্যতের জন্যে অনেক ভাবতেন। এখনকার মতো তখন এত সুযোগ না থাকলেও দাদা এদেশে থেকে ইংল্যান্ডের HERRIOT WATT UNIVERSITY -তে পড়াশোনা করেছে এবং ভালো ফলাফল করে সেখান থেকেই BBA, MBA করেছেন, বর্তমানে ACCA করছে।

শুধুমাত্র নিজের কঠোর পরিশ্রম, চেষ্টা, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ছিল বলেই অনেক সমস্যার মাঝেও দাদা সফল হতে পেরেছে। দাদা এখন সবসময় চেষ্টা করে যাতে তার ছোটো ভাইবোনকে তার মতো কষ্ট করতে না হয়।

যদি কখনো আমার মন খারাপ থাকে দাদা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমায় ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য উৎসাহ দেন। আমার শান্ত দাদার স্কলারশিপ পাওয়ার পেছনেও সৈকত দাদার অবদান অনেক।

যখন দাদার অফিসে যাই তখন দেখি দাদার চেয়ে বয়সে বড়োরাও দাদাকে সম্মান করছে। দাদা ওনাদেরকে খুব ভালোবাসে। সাফল্য আমায় আনতে হবে, তাই দাদাই আমার সুপার হিরো।

*৮ম শ্রেণি, বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।*

## একজন সুপার হিরো আমার বন্ধু

### তাওফিক রায়হান

আমার এই গল্পের সুপার হিরো হলো আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু বেল্লাল, তার প্রায় সকল কাজই আমাকে অনুপ্রাণিত করে। যেমন: সে সর্বদা সত্য কথা বলে, পরিবেশের সকল জীবজন্তুর সেবা করে, সে বড়োদের সব কথা মেনে চলে ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে, শিক্ষকদের সম্মান করে।

সে বড়ো হয়ে একজন ভালো মানুষ হয়ে থাকতে চায়। আমিও বড়ো হয়ে তার মতো হতে চাই। আমি চাই তার মতো সদা সত্য কথা বলতে, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে ও তাদের আদেশ নিষেধ মেনে চলতে। আর একজন ভালো মানুষ হয়ে সকলের উপকার করতে চাই। তাকে আমাদের এলাকায় প্রায় সকলেই চেনে একজন মেধাবী ও ভালো ছাত্র হিসেবে। অনেকেই এই রকম মানুষকে শুধুমাত্র কল্পনার সুপার হিরোই ভেবে থাকে। কিন্তু আমি তার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। আমার বন্ধু আমার কাছে বাস্তবের সুপার হিরো। তাকে আমি বাস্তবেই আমার সুপার হিরো মনে করি। সে সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। সে বলে 'কখনোই হাল ছেড়ে দিয়ো না'।

আমার ও তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। যেমন: সে গল্পের বই পড়তে খুবই ভালোবাসে। আমিও গল্পের বই পড়তে খুব ভালোবাসি। তার মতো একজন বন্ধু পেয়ে আমি খুবই গর্বিত। যদি সকলের এমন একজন করে বন্ধু থাকে তবে সকলেই দেশ ও জাতির উন্নয়নের সুযোগ পাবে। আমি আমার বন্ধুকে খুবই ভালোবাসি।

*সপ্তম শ্রেণি, বরগুনা জেলা স্কুল, বরগুনা।*

# সুপার হিরো ‘বাংলাদেশ’

**শাহানা আফরোজ**

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট এই দেশটি গাঙ্গেয় অববাহিকায় সাগর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। নদীমাতৃক এ দেশের পলিমাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। সুন্দরবন, দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, রূপালি ইলিশ, হাওর-বাঁওড়, পাহাড়, সাজানো চা বাগান ঘেরা এ দেশটি পর্যটনের আকর্ষণীয় স্থান। এ দেশের ছয় ঋতুর সাথে খেলা করে প্রকৃতি আর মানুষ। হৃদয়ের ক্যানভাসে যেন আঁকা ছবি। এ দেশ কারো কারো কাছে রোল মডেল। কিন্তু আমার চোখে বাংলাদেশ সুপার হিরো, সুদূর প্রাচীনকাল থেকে এ দেশ যুদ্ধ করেছে অন্যায় আর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। যখন এ দেশ অখণ্ড ছিল তখনও লড়াই করেছে। ব্রিটিশ শাসন থেকে এই উপমহাদেশকে মুক্ত করতে জীবন দিয়েছে এদেশের মানুষ। মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার ছিনিয়ে আনতে প্রাণ বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। তাইতো বাংলা ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ১০টি ভাষার মধ্যে ৫ নম্বর। আমরাই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছি। পাকিস্তানি শোষণের নাগপাশ থেকে ছিনিয়ে এনেছি স্বাধীনতা। যুদ্ধ পরবর্তী দেশে নানা অরাজকতা তৈরি হলেও সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করে এগিয়ে গেছে দেশ। স্বীকৃতি প্রাপ্ত তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ থেকে আজ পরিণত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশে। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, চাল রপ্তানি হয় বিদেশে। আম উৎপাদনে সপ্তম, সবজি উৎপাদনে তৃতীয় এবং মৎস রপ্তানিতে চতুর্থ স্থান। পোশাক শিল্পের জগতে সুনামের সাথে শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশ সাইকেল রপ্তানিতে তৃতীয় কয়েক দশক ধরে। কুটির শিল্পসহ অনেক পণ্যই বিদেশের মাটিতে নিজেদের আসন স্থায়ী করেছে। পণ্যর পাশাপাশি মানবসম্পদ বয়ে আনছে সম্মান আর রেমিটেন্স। বিদেশের মাটিতে সেনাবাহিনী সেবা দিচ্ছে নিঃস্বার্থভাবে। তাইতো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা সূচকে দ্বিতীয় হয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বের অন্যান্য দেশ যা পারেনি তাই করেছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি মিয়ানমার থেকে অত্যাচারিত আর বিতাড়িত হয়েছে লক্ষাধিক মানুষ। এসব অসহায় মানুষদের আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা বাসস্থান দিয়ে পরিপূর্ণ করেছে তাদের জীবনযাত্রা। অপেক্ষা করছে মিয়ানমার সরকারের সসম্মানে ফিরিয়ে নেয়ার। সকল মানবিকতার উর্ধ্বে উঠে গেছে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে আশাবাদী দেশ হিসেবে প্রথম হয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের থেকেও নিরাপদ বাংলাদেশ। যে দেশে আমরা নিরাপদে বাস করতে পারি সে দেশ তো আমাদের কাছে সুপার হিরোই তাই না বন্ধুরা। ■

## মায়ের মতোই দেশ

**নাসির আহমেদ**

মা হারালাম সেই যে কবে, প্রিয় আমার মা
তার মতো কেউ আপন তো নেই, নেই তো তুলনা।
মা যে আমার কত কাছের, দিতেন কত আদর
তীব্র শীতে গরিব শিশুর কাছে যেমন চাদর।

মায়ের কাছে চাঁদনি রাতে শুনেছি রূপকথা
ভাবতে গেলেই বুকে বাজে মা হারানোর ব্যথা।
ঘুম পাড়াতেন ছেলেবেলায় শুনিয়ে কত গান
কোথায় যে মা হারিয়ে গেলেন, কিসের অভিমান!

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ জেগে উঠি
কান্নাভরা কণ্ঠে ডেকে মায়ের ঘরে ছুটি।
শুন্য ঘরে পড়ে আছে তসবি, কলম, বই
ফ্রেমে বাঁধা মায়ের ছবি, উদাস চেয়ে রই।

আমার চোখে কান্না দেখে আদর করে মামা
বলেন খোকা কাঁদিসনে, কাল দেবো নতুন জামা।
কারও মা কি থাকে বোকা বেঁচে চিরকাল
মা হয়ে যায় দূর আকাশের তারার মহাকাল।

দেশকে যদি মায়ের মতো ভাবতে পারিস আপন
সব দুঃখ মুছে যাবে, সুখের জীবনযাপন।
মায়ের মতোই মাতৃভূমি স্নেহে করে লালন
দেশকে ভালোবাসে মায়ের দায়িত্ব করো পালন।

## বাংলাদেশ

**সানজানা আহমেদ**

গাছের ডালে পাখি ডাকে
নদীর বুকে গায় মাঝি
শস্যশ্যামল বাংলাদেশ
সোনার চেয়েও খাঁটি
রাখালিয়া বাঁশির সুরে
মন ভেসে যায় দূর
এরই মাঝে মোরগ ডাকে
কুকরুকুক
চির সবুজ বাংলাদেশে
ঋতু করে খেলা
আনন্দ আর উৎসবে
ভেসে চলে ভেলা

*দশম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা*

## চলতে হবে

**মাসুমা রুমা**

কেউ বা থাকে অঙ্কে কাঁচা
কেউ দুর্বল ভাষায়
ভিন্ন কিছু করবে বলে
কেউ বা থাকে আশায়।

কেউ বোঝে না রঙের খেলা
কেউ পারে না বলতে
সফল হওয়ার কঠিন পথে
কেউ পারে না চলতে।

কেউ পারে না পাখির মতো
ডানা দুটো মেলতে
কেউ পারে না রাতের বুকে
তারার মতো খেলতে।

কেউ বা আবার আনন্দ পায়
হঠাৎ বাঁশির সুরে
কারও আবার কষ্টগুলো
থাকে জীবন জুড়ে।

তবু সবাই চলতে থাকে
চলতে হবে বলে
ক্লান্ত হলে ঘুমিয়ে পড়ে
মাতৃভূমির কোলে।

## এমন দিনে

**জাহাঙ্গীর আলম জাহান**

বিকেল যেন নিকেল করা
সোনার পাতে মোড়ানো
এই বিকেলে ভালোই লাগে
রঙিন ঘুড়ি ওড়ানো।
আকাশটা আজ ঢেকে আছে
সাদা মেঘের আস্তরে
এমন দিনে থাকলে খুকু
নূপুর পায়ে নাচতো রে।
খুকু গেছে পরির দেশে
সাজতে ঘুমের পরি সে
নিকেল করা বিকেলে তাই
বিষাদ আসে হরিষে।
আয় রে খুকু আয় দেখে যা
কিন্তু খুকু আসে না
নিকেল করা বিকেলও তাই
আগের মতো হাসে না।

## বাঁদর ও হুতুম প্যাঁচা

**দুখু বাঙাল**

দিন-দুপুরে হুতুম প্যাঁচা
উঁচু ডালে বসে
ঘুমের ফাঁকে বাঁদরটাকে
চোখ ঘুরায়ে শাসে।
বানর বানর সাঁইবানর
হাসে আবার নাচে
ডাল ঝুলিয়ে লাটিমগোটা
ছুঁড়ে ছুঁড়ে যাচে।
দিনকানা ভূত হুতুম প্যাঁচা
রাগে থরথর
পারে তো ছাই বানরটাকে
লাগায় দু'খান চড়।
এমন সময় শাঁ শাঁ রবে
এল ভুবনচিল
পুঁচকে বাঁদর দে ছুট বলে
শূন্যে ছোড়ে কিল।

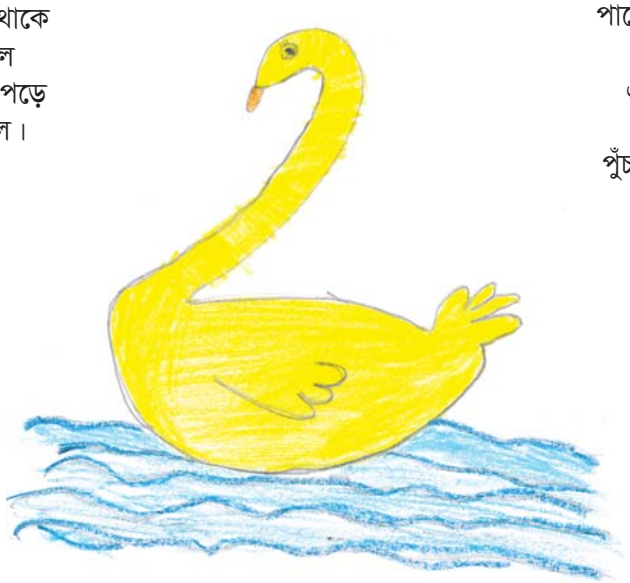

*আয়ান হক ভূঁইয়া-প্লে গ্রুপ-স্টার হাতেখড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল*

# বুবু

## জসীম মেহবুব

বুবুর বাড়ি মধুপুরে অনেক অনেক দূর
সেই বাড়িতে যেতে কত করেছি ঘুরঘুর।
মা বলেছেন যাসনে বাবা, ও দুরন্ত খোকা
তোর জন্য মা রেখেছি গোলাপজামের থোকা।
আর রেখেছি নকশিপিঠা ঘন দুধের সর
তুই বিহনে পুড়বে রে বাপ আমার এ অন্তর।
কিন্তু আমি যাবোই যাবো বুবুর বাড়ি ঠিক
বুবু আমার খেলার সাথি রেলগাড়ি ঝিকঝিক।
আল পেরিয়ে খাল পেরিয়ে ছুটেছি ভাইবোন
ছুটে গেছি সকল দিকে পুব-পশ্চিম কোণ।
পুকুরঘাটে আমের ডালে দুলেছি দুইজন
চড়ুইভাতির জন্য গেছি ঘন সবুজবন
লুকোচুরি খেলতে গিয়ে হারিয়ে যেতাম যদি
বন পেরিয়ে পার হয়েছি স্বচ্ছ সরু নদী।
নদীর ওপার ছিলেন বসে বুড়িমা থুত্থুরি
গল্প গাথায় সেই বুড়িমার ছিল না কো জুড়ি।
সন্ধ্যে হলে বুবুর কাছে ফিরলে অবশেষে
গল্পে আমি হারিয়ে যেতাম অচিন কোনো দেশে।
বুবু আমায় আপন করে জড়িয়ে নিত বুকে
সেসব কথা রেখেছি মা মনের খাতায় টুকে।
বুবুর সাথে ঘুরে ঘুরে যেই ফিরেছি বাড়ি
মা তুমি কি আমার সাথে রাখতে পারো আড়ি?
আড়ি ভেঙে আমার মাথায় বুলিয়ে দিতে হাত
বুবুর বাড়ির গল্পে তখন কেটে গেছে রাত।
বুবুর জন্য মনটা কেবল করছে থাকি থাকি
বুবু কি মা খাঁচায় পোষা বন্দি কোনো পাখি?
তাই যদি হয়, ঠিকই আমি ভাঙব অমন খাঁচা
বন্দি করার মজা তখন বুঝবে শ্বশুরবাছা।

# প্রজাপতির প্রতি

## গোলাম নবী পান্না

প্রজাপতির প্রতি মায়া
কার না আছে বলো?
তার পাখাতে আঁকা যেন
নকশা ঝলোমলো।

শিল্পী তাকে ভালোবেসে
আঁকে তারই ছবি,
রূপ-উপমা দিয়ে লেখে
প্রাণের প্রিয় কবি।

চোখের পাতায় আটকে থাকে
তার সে উড়ে যাওয়া,
প্রজাপতির কাছে রঙিন
স্বপ্নগুলো চাওয়া।

## একটি পাখি

**আজিম হোসেন**

একটি পাখি গাছের ডালে
একা বসে কাঁদছিল,
তাই না দেখে খোকন সোনা
কী যেন কী ভাবছিল!

দৌড়ে গিয়ে খোকন সোনা
বাবা-মাকে ডাকছিল,
আপন মনে বাবা-মাও
পাখিটা-কে দেখছিল।

খোকার মনে পাখির তরে
অনেক মায়া জমছিল,
আদর করে তাই তো খোকা
পাখিটা-কে ডাকছিল।

## পরিচিতি

**শাহরুবা চৌধুরী**

এই যে দেশ সবুজ শ্যাম
পুকুর নদীর জল
সবকিছু আমার মনে
জোগায় বাঁচার বল।

এই যে গাছে টিয়ে নাচে
ঘুঘু শোনায় গান
রাখাল বাজায় সুরে বাঁশি
শুনে জুড়ায় পান।

এই যে বিলে শাপলা ভাসে
ভাসে কলমির লতা
বাউল নেচে গান গায়
আবেগ ভরা কথা।

এই যে চাষির মুখে হাসি
সোনার ফসল ফলায়
কৃষান মেয়ে ফুল কুড়ায়
ভোরে গাছের তলায়।

এই যে গাঁয়ের পথের পাশে
কলাপাতা দোলে
তালের ডালে বাবুই পাখি
গানের সুর তোলে।

## আমার বাবা কিষান বাবা

**মীর জামাল উদ্দিন**

আমার বাবা কিষান বাবা জমিতে দেয় চাষ
সময়মতো উপরে ফেলে আবর্জনা ঘাস
ভালো বীজের চারা এনে রোপণ করে নিজে
সেচের পানি টেনে নিতে আনন্দ পায় কি যে।
কোথাও পানি ছুটে গেল ভাঙলো কি আল - পাড়
সময়মতো দেয় ছিটিয়ে জমিতে খাবার সার।

দিনে দিনে ধানের চারা মোটা তাজা হয়
ধানের চেয়েও মোটা তাজা যাকে হলস কয়
হলস যখন বাড়তে থাকে আসল ধানের চারা
যায় মুটিয়ে হয় না ফসল খড় বিচালি ছাড়া
তাই তো বাবা মূল সুদ্ধো উপরে ফেলে হলস
সোনার ধানে মাঠ ভরতে রয় না বাবা অলস।

আমার বাবা কিষান বাবার গোলা ভরা ধান
খেয়ে দেয়ে সুখে আছে ঊর্ধ্বে রেখে মান
বাবা বলেন, সমাজ ভূমে হলস শত শত
সমূলে উপরে ফেলার কাজটি অবিরত
করা হলে বরফ গলে বইতো সুখের নহর
উঠত হেসে গ্রাম-গঞ্জ বাংলাদেশের শহর।

*কাজী নাফিসা তাবাসসুম,*
*একাদশ শ্রেণি*
*ভিকারুন নিসা নূন স্কুল*
*অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা*

# নতুন বইয়ের গন্ধ

**মাহমুদউল্লাহ**

জানুয়ারি এলে বড়ো ভালো লাগে সাজুর। ভরা শীত। রস খাও, পিঠা, পায়েস খাও-সে তো আছেই। ফসলও তোলা হয়ে যায়। খোলা মাঠে খেলতে, ঘুরে বেড়াতে পারো, সেই বা কম কি। ওপরের ক্লাসে ওঠা সে এক বড়ো কৃতিত্ব বটে। গত পাঁচ বছরে পাঁচটি ক্লাস পেরিয়েছে সে। এবারে উঠেছে ক্লাস সিক্সে।

হ্যাঁ, ওপরের ক্লাসে ওঠার মজাই আলাদা। শরীর-মন কেমন ঝরঝরে লাগে। নতুন ক্লাসে বসতে বসতে মনে হয়, হঠাৎ যেন অনেকখানি বড়ো হয়ে গেছি। নতুন বইয়ের পাতায় পাতায় প্রাণ মাতানো গন্ধ। সাজু সেই প্রিয় ঘ্রাণ টেনে নিত নিশ্বাসের সঙ্গে। নতুন ক্লাসের বাংলা বইটি হাতে পেয়েই সে ছড়া-কবিতাগুলো একটানা পড়ে ফেলত। কী যে মজা লাগত তার।

তবে এ বছর সে কথা মনে করতেও তার বুক ভেঙে যায়। ফাইভ থেকে সিক্সে উঠেছে সে। তাহলে কী হবে। লেখাপড়ার সুযোগ নেই তার। তাদের এই নতুন চরাঞ্চলে হাই স্কুল নেই। বাড়ি থেকে সাত-আট কিলোমিটার দূরে উপজেলা শহরে হাই স্কুল আছে দুটি। কিন্তু সেখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। বাবাকে হারিয়েছে রাজু। মা জমির ফসল থেকে সামান্য যা আয় হয়, তা দিয়েই কোনোরকম চালিয়ে নিচ্ছেন সংসারটা। শহরে, বন্দরে রেখে সাজুকে পড়ানোর সামর্থ্য নেই মায়ের।

মাঠে একা ঘুরে বেড়ায় সাজু। পড়ে থাকা খড়ের ওপর বসে নানা চিন্তাভাবনা করে। সেদিন পুকুরের পাড়ে খেজুর গাছের নালা বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রস পড়ার দৃশ্য দেখছিল সে। কোথা থেকে একটা পাখি উড়ে এসে নালা থেকে রস শুষে নিতে লাগল। মা দূর থেকে আজুকে লক্ষ করলেন। লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে না বলে ছেলেটার মন খারাপ। পড়বে, বড়ো হবে, কত আগ্রহ তার। অথচ তার পড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

তবে মা ভেবে ভেবে আজ একটা উপায় খুঁজে পেলেন। যদিও ওপথে তিনি যেতে চাননি। সাজুর কাছাকাছি এসে তিনি বললেন বাপ একটা কাজ কর। আমার চাচাতো ভাই এমদাদের ওখানে যা। কাচারির হাটে তার দোকান আছে। তাকে ওখানে না পেলে বাড়িতে চলে যাবি। বাসমতির হাট হাই স্কুলে তোর জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে কি-না দেখি। তোর মামাবাড়ি থেকে মাইল দেড়েক দূরে স্কুল। তার নিজের বাড়িতে রাখতে না পারলে একটা লজিং-এর ব্যবস্থা করে দিক। আমি চিঠিতে সবই লিখে দেব। কালই সকালে চলে যা।

এরপর মা যা বললেন তার অর্থ হলো, তিনি তার বাপের বাড়ির দিকের স্বজনদের কাছে নিজেকে ছোটো করতে চান না। তার নিজের কোনো আপন ভাই নেই।

তিন কিলোমিটার নদী পথ পেরুল সাজু। ভরদুপুরে হাঁটল ভাঙাচোরা, উঁচুনিচু দুই কিলোমিটার পথ। কাচারির হাটে এসে দেখল মামার দোকান বন্ধ। ডান দিকে মামাবাড়ির পথ ধরে এগিয়ে গেল সে। অপরাহ্নে মামাদের উঠোনে পা রাখতেই তার চোখে পড়ে তাদের বিশাল টিনের ঘরটার দরজায় বড়ো একটা তালা ঝুলছে।

সাজু এখন শ্রান্ত-ক্লান্ত। পানির পিপাসাও পেয়েছে তার। কিন্তু এসব অনুভূতি মুহূর্তেই উবে গেল তার শরীর মন থেকে, যখন সে দেখল মামার ঘরের দরজায় ঝোলানো বড়ো তালাটি। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চশমা পরা এক বুড়ো। চোখ বড়ো করে তাকালেন সাজুর দিকে। হ্যাঁ, চিনতে পেরে বললেন, তুমি কী মনে করে।'

মা পাঠিয়েছেন মামার কাছে। আমার পড়ার ব্যবস্থা করার জন্য। সংক্ষেপে সব কথাই বলল সাজু। তার কথা শুনে বুড়ো বললেন, হ-আশা কইরা পাঠাইছে, খারাপ করে নাই। তয় কথা অইল তোমার মামাইতো বাঁচে না। আগে বাঁইচা আসুক, তারপর যা করার করবো।

বুড়োর কাছে সবকিছু শুনল সাজু। মামার ব্লক না কি কী যেন ধরা পড়েছে। অপারেশন হবে। তাকে নিয়ে ঘরের সবাই ঢাকা গেছে।

সাজু আর দাঁড়াল না। বুড়ো তাকে ঘরের ভেতর নিতে চাইল। ভাত খেতে বলল। সাজু মৃদু হেসে তাকে সালাম জানিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। সন্ধ্যার ফেরিটা ধরতে পারলে রাত আটটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছাতে পারবে।

বিকেলের রোদ মরে এসেছে মামার বাড়ির দরজায়। স্কুলের টিউবওয়েল চেপে পেট পুরে পানি খেয়ে নেয় সে। বাড়ির পাশেই দেখল বাগানের মাঝ দিয়ে বিলি কেটে আঁকাবাঁকা পথ গেছে মাঠের দিকে। কটা ফুলের গন্ধ সাজুর মনকে বিষণ্ন করে তোলে। একে তো মামার অসুখের কথা শুনে তার মনটা ব্যথায় ভরে আছে, তার ওপর ফুলের এই গন্ধটা সেই ব্যথাকে আরো গভীর করে তুলেছে। বিকেল শেষ না হতেই বাগানের পথে সন্ধ্যা নামছে। একটা হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে তার বুক জুড়ে। সে নিজেকেই বলল, তার বুঝি লেখাপড়াটা আর হলো না। মেঠো পথে চলতে চলতে কয়েকটি ছেলে-মেয়েকে কলাই শাক তুলতে দেখে সে। হলুদ সরষে ক্ষেতের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ হেঁটে সে পৌঁছে যায় মাঠের প্রান্তে। আম-জাম-শিরীষ কদমের বাগানটা পেরুতেই চোখে পড়ে ধবধবে ফেরিটা। বোধ হয় এখনই ছেড়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে তড়িঘড়ি উপরে উঠে যায় সাজু।

কখনো এখানে ঘুরে, কখনো রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে নদী দেখে সময় কাটায় সে। ভালো লাগে বিপরীত দিক থেকে আসা লঞ্চগুলোকে। উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে ঢেউ তুলে চলে যায় তাদের ফেরির পাশ দিয়ে। চা-স্টল থেকে এক কাপ চা আর একটা বনরুটি খেয়ে নেয় সে। কেটে যায় অনেক সময়। নদীতে গড়ায় অনেক পানি।

*তাসনিম মাহদী, তৃতীয়, শিশুমেলা প্রিপারেটরী স্কুল*

হঠাৎ জোরে ধাক্কা লেগে ফেরিটা এক দিকে কাৎ হয়ে যায়। কে একজন চিৎকার করে বলে ওঠে, চরে উঠিয়ে দিয়েছে-কানা ব্যাটা চোখে দেখে না।

আরেকজন বলল, চরকাঞ্চনের টেকটাও দেখল না ব্যাটা। চরকাঞ্চন নামটা শুনে চমকে ওঠে সাজু। এটা তো তাদের গ্রামের কাছের কোনো চর নয়। সে যে উলটো পথে অনেক দূর চলে এসেছে। ভুল ফেরিতে উঠেছে। নদীর ঘাটে টিকেট কাউন্টার থাকলে এই ঝামেলাটা হতো না। কিছুক্ষণ পর টিকেট মাস্টার এল ভাড়া চাইতে। সাজু বলল, সে কমলগঞ্জ যাবে। জবাব এল, আজ ওদিকে যাবে না। এই ফেরি রসুলপুর যাবে, তুমি নেমে যাও। নির্ধারিত ভাড়া দিতে হলো সাজুকে।

জোয়ারের পানি বাড়লে ফেরিটি ছাড়া পেল। রসুলপুরে ফেরি থামলে নেমে গেল সাজু। নামল আরো আট-দশজন। দু-এক মিনিটের মধ্যে কে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ঠাওর করা গেল না।

নদীর তীর ধরে কিছুটা পথ এগিয়ে যায় সাজু। বাঁ দিকে চোখ পড়ে। একটা সংকীর্ণ খাল গেছে এঁকে বেঁকে। যেতে যেতে সে দেখে খালের ওপারে বাঁশঝাড় আর বড়ো বড়ো গাছের সমাবেশ। ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় ঘরবাড়ি। চলতে চলতে রাস্তার ডানপাশে একটা বাজার দেখতে পায় সে। রাত নিঝুম। লোকজন নেই। চায়ের দোকানের সামনে শিশিরে ভেজা একটা বেঞ্চের খানিকটা মুছে নিয়ে সেখানে বসে পড়ে সাজু।

ঠান্ডা পড়েছে। সুতির চাদরখানা ভালোভাবে গায়ে জড়িয়ে নেয় সে। সারাদিনের ক্লান্তি। শরীর এলিয়ে পড়তে চায়। বাঁশের বাখারি দিয়ে বানানো বেঞ্চখানা শিশিরে ভেজা না থাকলে তার ওপর সে এক্ষুণি শুয়ে পড়ত। সাজু ঘুমে ঢুলতে থাকে। এমন সময় টর্চের আলো পড়ে তার মুখে। দুজন লোক এসে দাঁড়ায় তার সামনে। তাদের একজন ধমক দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, এখানে কে-রে? তুই কে ?

আমি-আমি সাজেদ সাজু
এখানে কী ? চুরি-টুরি করার মতলব নেই তো !
জ্বি-না-আমি বাড়ি থেকে...
বাড়ি কই তোর ?
কমলগঞ্জ।
সে তো আরেক জেলায়। তা এখানে কেন ?

আমি ইচ্ছে করে আসিনি। ভুল ফেরিতে উঠেছিলাম। এই যে দেখেন মায়ের চিঠি। সাজু পকেট থেকে বের করে আনা চিঠিটা লোকটার হাতে দেয়। টর্চের আলোতে চিঠিটা পড়ল তারা দুজনই। অপর লোকটি শুধাল, তা হলে মামার কাছে গিয়েছিলে তুমি ?

জ্বি। তার অসুখ। ঢাকা গেছে। আর আমি কমলগঞ্জ যাব বলে ভুল ফেরিতে উঠি। আচ্ছা, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। বলতে বলতে ভদ্রলোক সামনে পা বাড়ান তার সঙ্গীকে নিয়ে।

দুজনের সঙ্গে কাঁচা রাস্তা ধরে সামনে এগোয় সাজু। তারা নিজেদের মধ্যে কী-সব আলাপ-আলোচনা করছে। এক সময় ডানদিকের একটা কাঁচা রাস্তার দিকে মোড় নিতে নিতে একজন বলল, তা হলে কাল সকালে স্কুলে দেখা হবে। বইগুলো নিয়ে এসো তারেক।

সাজু বুঝতে পারল সে তারেক সাহেবের সঙ্গে কথা বলছে। পুল পেরিয়ে একটা হাটে পৌঁছে তারা। তোফেজ বেপারির হাট। এল একটা একতলা দালানের সামনে। সাইন বোর্ডে লেখা, মানুষের জন্য মানুষ। ছোটো ছোটো অক্ষরে আরো কী সব লেখা। কল্যাণমূলক সংগঠন ইত্যাদি। সব বুঝতেও পারে না সে। তারেক সাহেবের নির্দেশ পালন করে কলতলা থেকে হাত-পা ধুয়ে চোখেমুখে পানি ছিটিয়ে দিয়ে বেশ তাজা ভাব নিয়ে ঘরে ফেরে সে। নতুন এই আশ্রয় দাতাটি বলেন, আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি। ভাত-তরকারি যা আছে তুমি খেয়ে নাও।

খাওয়াদাওয়ার পর কিছু কথা হয় তারেক সাহেবের সঙ্গে। তিনি সব কিছুই জেনে নেন সাজুর কাছ থেকে। বুঝতে পারেন, ছেলেটার লেখাপড়ার বেশ আগ্রহ আছে। সব শুনে বলেন, যাও ঘুমাও কী করা যায় কাল দেখা যাবে।

পরদিন সকালে তারেক সাহেবকে অনুসরণ করে সাজু। রাস্তা ধরে চলতে চলতে ডান পাশে বড়ো একটা মাঠ দেখতে পায় সে। খেলার মাঠ। তার এক প্রান্তে স্কুল গড়ে তোলা হয়েছে। নামফলক চোখে পড়ে সাজুর। তাতে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা সুনীতি কুসুম উচ্চ বিদ্যালয়। স্কুলের দিকে পথ চলতে চলতে তারেক সাহেব বলেন, এটাই হবে তোমার স্কুল। কিছু ছেলের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও আমরা রেখেছি। আমাদের সংগঠন মানুষের জন্য মানুষ স্কুলটি চালায়। ভেবো না-যা করার আমিই করব। সাজু আবার নতুন বইয়ের গন্ধ পায়। ■

# সুপারবাগ

## অনিক শুভ

ইতিহাসের পাতায় খুঁজলেই পাওয়া যাবে সংক্রামক ব্যাধি মহামারির গল্প যা ধ্বংস করেছে একের পর এক শহর, জনপদ আর সভ্যতা। কলেরা, ম্যালেরিয়া আর যক্ষ্মার মতো ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের প্রাদুর্ভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কোটি মানুষের জীবন। স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আবিষ্কার করেন প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাখো মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দেওয়া এই ওষুধকে ডাকা হতো 'মিরাকাল ড্রাগ'। চিকিৎসা শাস্ত্রে পৃথিবী জুড়ে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে পেনিসিলিন।

আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাফল্যের অন্যতম হাতিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক, যার সাহায্যে কোটি কোটি রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু কোনো কারণে যদি এ অ্যান্টিবায়োটিক কাজ না করে তাহলে তা মারাত্মক বিপদের ইঙ্গিত করে। সম্প্রতি গবেষকরা অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনকারী জীবাণুর সন্ধান পাচ্ছেন, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সুপারবাগ হচ্ছে এমন এক ব্যাকটেরিয়া যার বিরুদ্ধে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই কাজ করে না।

ই-কোলি ব্যাকটেরিয়ার সাথে যুক্ত এই সুপারবাগ প্রাথমিক অবস্থায় প্রস্রাবের রাস্তা অথবা শ্বাসনালীতে ক্ষত সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সুপারবাগ অন্যান্য গুরুতর ব্যাধির জীবাণুর সাথে যুক্ত হলে ওই রোগগুলোতে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না। উন্নত বিশ্বে সুপারবাগ এখন এক আতঙ্কের নাম। যদিও এটা অবধারিত যে, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে এর বিরুদ্ধে একসময় না একসময় প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবেই। কিন্তু আমাদের অসচেতনতা এবং অবহেলার কারণে এসব প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া তৈরি হচ্ছে হাজার হাজার গুণ দ্রুতগতিতে।

আমরা না জেনে, না বুঝে যত্রতত্র অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করছি, এমনকি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই। ডাক্তাররাও প্রায়শই যথাযথ ল্যাব টেস্ট না করে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশনে লিখে দিচ্ছেন। ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে রোগের প্রকৃত কারণ বের না করে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন দিলে তাতে চিকিৎসায় ভুল হওয়ার অনেক বেশি আশঙ্কা থাকে। আর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স সম্পূর্ণ না করা। গবেষণায় দেখা গেছে, অল্পমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিরোধী হয়ে উঠতে সহযোগিতা করে এবং পরবর্তীতে বেশি মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলেও তাতে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকতে পারে। কাজেই অ্যান্টিবায়োটিকের সুপারিশকৃত ডোজ সম্পূর্ণ করা উচিত যাতে ব্যাকটেরিয়া সহজে প্রতিরোধী হয়ে উঠতে না পারে।

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ব্যতীত আরো যেসব দৈনন্দিন চর্চা অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার

বিস্তৃতিতে সহায়ক তা হলো, ল্যাব টেস্টিং এবং মনিটরিংয়ের অভাব। হাসপাতালে বা নিজের বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, রোগ সংক্রমণে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ না থাকা, ঘন ঘন হাত না ধোয়ার অভ্যাস, হাত ধুতে সাবানের ব্যবহার না করা, ঠিকভাবে হাত ধুতে না জানা, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব ইত্যাদি। অ্যান্টিবায়োটিকের অভাবে শুধুই সংক্রামক রোগ নয়, অন্যান্য অনেক রোগ যেমন ক্যানসার, আর্থাইটিস এবং কিডনি রোগের চিকিৎসাও সম্ভব নয়। কেননা এসব ক্ষেত্রে রোগীকে এমন সব ওষুধ দিতে হয় যা আমাদের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে ফেলে, যাতে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

২০৫০ সালের মধ্যে যদি বিশ্ব জরুরি পদক্ষেপ না নেয় তাহলে ব্যাকটেরিয়া সুপারবাগ প্রতি তিন সেকেন্ডে একজনকে হত্যা করবে। সুপারবাগ থেকে বাঁচার জন্য বর্তমানে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। পাশাপাশি মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে গণহারে প্রচারণা চালাতে হবে। বর্তমান বিশ্বে ওষুধ ব্যবহার করে ইনফেকশন থেকে বাঁচার পদ্ধতি খুব দ্রুত অকার্যকর হয়ে পড়ছে।

সুপারবাগ বা ব্যাকটেরিয়া বাড়িতেও ঘাঁটি গাড়তে পারে। শুধুমাত্র পচা বা বাসি কোনো বস্তু থেকে নয়, বাজার থেকে আনা কাঁচা মাংস থেকে হতে পারে এই সুপারবাগ। বাজারে যে কাঁচা মাংস বিক্রি হয় তাতে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে তাই এ থেকে মানুষের দেহে সংক্রমিত হলে ব্যাকটেরিয়াগুলো মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় ফলে মানুষ সহজেই অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়। ফ্রিজে দীর্ঘদিন ধরে বেশি মাংস সংরক্ষণ করা উচিত না কেননা যে তাপমাত্রায় অল্প মাংস রাখা উচিত, সে তাপমাত্রায় বেশি পরিমাণ মাংস সংরক্ষণ করলে রান্না করার সময় ব্যাকটেরিয়া মরে যাওয়ার বদলে গাণিতিক হারে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে বিশেষজ্ঞদের মতে, যে বোর্ডে সবজি বা মাংস কাটা হয় সেটি কাচের হলে ভালো প্লাস্টিক বা কাঠের বোর্ড থেকে সহজেই ব্যাকটেরিয়া অন্য খাবারে চলে যায়। কাঁচা মাংস, মাছ, সবজি বা সালাদের জন্য আলাদা বাসন-পত্র ব্যবহার করা উচিত। রান্না হলে জীবাণুগুলো যেমন মরে যায়, তেমনই কাঁচা খাবার থেকে ছড়িয়ে পড়া ব্যাকটেরিয়া সুপার ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয়। আসলে এ সব খাবার রান্নার পর আবারো যদি কাঁচা খাবার নাড়ার কোনো আসবাব দিয়ে খাবার নাড়া-চাড়া করা হয়, তবে ব্যাকটিরিয়া রান্না করা খাবারে প্রবেশ করে। বেশিরভাগ জীবাণু ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপামাত্রায় মরে যায়। তাই কাঁচা মাংস সঠিকভাবে রান্না করা হয়েছে কিনা, তা ভালোভাবে দেখে নিতে হবে। মাইক্রোওয়েভে রান্না করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব জীবাণু মরে যাবে কিনা তার কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই। রান্নার আগে এবং পরে গরম পানি এবং সাবান দিয়ে হাত ভালো করে ধোয়া উচিত। এছাড়া মাছ, মাংস কাটা এবং ডিম ফাটানোর পর সাথে সাথে হাত ভালো করে ধোয়া জরুরি তা না হলে গ্লাভস ব্যবহার করলে ভালো হয়। রান্না ঘরের বাসন-পত্র ও আসবাব গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত। এছাড়া কাঁচা মাছ, মাংস যেসব বাসনে রাখা হয়েছিল, সেগুলো ডিশওয়াশারের ভেতর ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ধোয়া অত্যন্ত জরুরি।

তিন বছর গবেষণার পর মেলবর্ণ ইউনিভার্সিটির ২৫ বছর বয়সী ছাত্রী সু ল্যাম এর দাবি অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া তিনি সুপারবাগ মারার পন্থা আবিষ্কার করেছেন যার পরীক্ষা ইঁদুরের উপর সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। এই সুপারবাগগুলোর উপর অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজ করে না। অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক সুপারবাগগুলি বছরে ১৭০,০০০ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউনাইটেড নেশান সম্প্রতি একে সাস্থ সংক্রান্ত 'মৌলিক হুমকি' বলে ঘোষণা করেছে। খুব শীঘ্র এর সমাধান না করতে পারলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভয়ংকর সমস্যার সম্মুখিন হতে হবে। বৈজ্ঞানিকরাও এই সমস্যার সমাধানে ব্যার্থ হচ্ছেন। সু ল্যাম বিশ্বাস করেন যে তিনি এই সাস্থ্য সংক্রান্ত ভয়ংকর সমস্যার সমাধানের চাবি পেয়ে গেছেন এবং তাঁর দল তারকাকৃতি পেপটাইড পলিমার উদ্ভাবন করেছেন যা ঐ অপ্রতিরোধ্য সুপারবাগগুলোর কোষ প্রাচীর ছিঁড়ে ফেলে ও সুপারবাগগুলোকে মেরে দেয়। ল্যাম এর এই আবিষ্কার সম্প্রতি নেচার মাইক্রোবায়োলজি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষাগারে ইঁদুরের উপর সফল হলেও অনেক পথ বাকি। ল্যামের বিশ্বাস খুব শিঘ্রই তারকাকৃতি পেপটাইড পলিমার এসে অ্যান্টি বায়োটিকের জায়গা দখল করবে। ■

গল্প

# বুনডি

## কাজী কেয়া

উৎসর্গ : জবাফুল ও ডালিমকুমারের মতো সব ভাইবোনের হাতে

বোন জবাফুল। ডালিম কুমার ডাকে বুনডি বলে। বুনডি স্কুলের সেরা ছাত্রী। এবার খুব ভালো রেজাল্ট করে এসএসসি পাস করেছে। ঢাকার ভালো কলেজে ভর্তি হবে।

আজ তাই বাবার সঙ্গে ঢাকা যাবে। মন ভালো নেই ডালিম কুমারের। ভাই আর বোন। বোনের চেয়ে ৬ বছরের ছোটো ডালিম কুমার।

মা ছবিতুন শখ করে ওদের নাম রেখেছিল। জবাফুল আর ডালিম কুমার। মা ডাকত, আয়রে আমার জবাফুল! মায়ের ডাকে জবাফুল ছুটে এসে বলত, এইত আমি।

মা ওর মাথায় তেল মেখে, চুল আঁচড়ে, লাল ফিতে দিয়ে চুলে বেণি বেঁধে দিত।

মা ডাকতো, কই গেলিরে ডালিম কুমার আমার?.. ডালিম কুমার দৌড়ে এসে মায়ের কাঁধে হাত রেখে বলতো, এই তো আমি আইছি, ক্যান ডাকলে বলো ?

মা বলতো, বেলা হইছে, চলো গোসল করে দিই। ভাত খায়ে একটু ঘুম দেবা।

তবে, পাড়া-প্রতিবেশিরা ওদের জবা আর ডালু বলে ডাকে।

জবাফুলের বয়স যখন ১০ বছর, আর ডালিম কুমার ৪ বছরের, তখনই মা মারা গেল। মায়ের হয়েছিল কঠিন অসুখ। গ্রামের ডাক্তাররা বলল, ঢাকা শহরে বড়ো ডাক্তারকে দেখাতে। কিন্তু রহিমুদ্দিন গরিব মানুষ। টাকার অভাবে শহরে নিয়ে যেতে পারেনি।

মায়ের দু'পাশে শুতো জবা-ডালু। সে-রাতে মায়ের শরীর আরো খারাপ ছিল। ছোট্ট ডালুর চোখে রাজ্যির ঘুম নেমেছিল। কিন্তু জবা জেগে ছিল মায়ের পাশে। জবার বাবা রহিমুদ্দিও পাশে বসে ছিল। সেদিন ছিল শুক্রবার। খুব ভোরে। মোরগ ডাকারও আগে। মা পানি খেতে চাইল। জবা চট করে উঠে ঘরের কলসি থেকে এক গ্লাস পানি এনে মায়ের মুখে ধরল। মা একটুখানি খেয়ে চোখ বুজল। আর চোখ খোলেনি মা।

রহিমুদ্দি তার গায়ে হাত দিয়ে দেখে শরীর বরফের মতো শীতল। জবাকে কাছে টেনে নিয়ে রহিমুদ্দি ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, জবা-রে... তোর মা আর বাঁইচে নেই।

জবাও মাকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। তার কান্নায় ডালুর ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে কিছু বুঝল না সে। সবার মুখের দিকে তাকাতে থাকে। পাড়ার সবাই ছুটে

আসে। সবার চোখে পানি। এদের কান্না দেখে ডালুও কেঁদে উঠল।

মা নেই ওদের। পাড়ার সবাই ওদের খুব ভালোবাসে। পাশের বাড়ির ডলির মা কুলসুম চাচি সব সময় খবর নেয় ওদের। দুপুরবেলা নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। ডলি স্কুলে যায়। জবাকেও সেই স্কুলে ভর্তি করে দেয় রহিমুদ্দি। ডলি আর জবাফুল একসঙ্গে স্কুলে যায়।

জবা ছোট্ট হলেও রান্নাবান্না শিখে নেয় কুলসুম চাচির কাছে। রহিমুদ্দি পাড়া-পড়শিদের বলে বেড়ায়, আমার ছোট্ট মাইয়া জবাফুল পড়াশোনায় যেমন, রাঁধনবাড়নেও তেমনি পাকা। ওদের মা নাই, কিন্তু আমার খাওনের কোনো কষ্ট হয় না। ছোট্ট ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চায় রহিমুদ্দি। ওদের মায়ের ইচ্ছা ছিল ছেলে-মেয়ে দুটিকে লেখাপড়া করাবে অনেক দূর পর্যন্ত। রহিমুদ্দিকে প্রায় জিজ্ঞেস করত, কন তো, কোন পর্যন্ত লেখাপড়া দিলে বড়ো মানুষ হওয়া যায়? রহিমুদ্দি হেসে বলত, আমি চাষাভুষা মানুষ, অত কি বুঝি? তয়, হুনছি, এমএ-বিএ পাস দিলে নাকি লোকে কয় শিকখিত মানুষ। ছবিতুন তার কথার রেশ ধরে বলত, হ, তয় আমার জবা ফুল আর ডালিম কুমাররে ওর চাইতেও বেশি লেখাপড়া শিখাবো।

মায়ের সেই কথা ভোলেনি জবা ফুল। মা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। গরিব বাবা তারে শহরে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসা করাতে পারেনি। সে কথা ভেবে এখনো জবাফুলের চোখ জলে ভরে যায়। জবা প্রতিজ্ঞা করে সে অনেক বড়ো ডাক্তার হবে। গ্রামের গরিব মানুষের চিকিৎসা করবে। তার মায়ের মতো আর কোনো মাকে বিনা চিকিৎসায় সে মরতে দেবে না।

আজ মেয়ে জবা ফুল স্কুলের পড়া শেষ করে ঢাকায় কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছে– ভেবে রহিমুদ্দির বুক গর্বে ভরে যায়। পরক্ষণেই তার বুকের ভেতর থেকে একটা কষ্ট বের হয়ে আসে। ভাবে, আজ ওর মা থাকলে কত যে খুশি হতো!

এদিকে, বোন ঢাকা যাচ্ছে আরো পড়াশোনা করতে, কিন্তু ডালু মন খারাপ করে উঠোনের কোণে চুপচাপ বসে আছে। জবারও মন ভালো নেই। ছোটো ভাইটাকে ছাড়া সে একমুহূর্ত থাকতে পারে না। মা মারা যাওয়ার পর ডালুও বোন ছাড়া কিছু বোঝে না। জবাফুল, ভাইকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, ভাইডি, আমি যাচ্ছি আরো বেশি পড়াশোনা করতে। এতে তো তোমার খুশি হওয়ার কথা। তুমিও স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে পড়বা। আমি হবো ডাক্তার, আর তুমি ইঞ্জিনিয়ার।

বোনের কথা শুনে ডালিম কুমারের মনটা একটু ভালো হয়। বলে, না আমি প্রফেসর হব। ওর কথা শুনে জবাফুল মিষ্টি করে হেসে ওঠে, ঠিক আছে ভাইডি, তুমি তাই হবা। তয়, আমার যাওয়ার সময় তুমি একটু হাসো!

ডালিম কুমার হেসে বোনের গলা জড়িয়ে ধরে।

ডালিম কুমার বলে, তা বুনডি, তুমি আবার কবে আসবে?

বোন বলে, ঈদের ছুটি, পূজার ছুটি– কত ছুটিই তো পাবো। আর ছুটি পালেই আমি আসবোই। তো ভাইডি, তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া করলে আমার মন ভালো থাকবে।

ডালিম কুমার বলে, তো, তুমি ঢাকায় থাকলে আমারে খুব ভোরে পড়ার জন্য কে উঠায়ে দেবে শুনি? ঠিক আছে আমি পড়াশোনা করব না, বেলা পর্যন্ত ঘুমায়ে থাকব। স্কুলেও যাবো না। আর তোমার জন্য মন কাঁদলে আমি ভাতও খাব না।

বোন হাসে। হেসে বলে, তোমার জন্য একটা জিনিস আনতে পাঠাইছি। তুমি ওটার নাম দিও বুনডি। সে তোমারে আমার মতো খুব সক্কালে ডাক দিয়ে ওঠায়ে দেবে। আমার কথা মনে হলেই তুমি ওরে বুনডি বলে ডাকবা। দেখবা সে ছুটে আসবে।

কী সেডা? সেডা কি মানুষ? ডালিম কুমারের প্রশ্ন শেষ না হতেই পাড়ার হেকমত চাচা ঝুঁটিঅলা একটা লাল মোরগ নিয়ে এসে জবাকে দিল। বলল, এই নাও মা। দাম পড়ছে দুইশ টাকা।

জবা মোরগটা নিয়ে বলল, এটা আমার ভাইডির জন্য। এই বলে, ডালিম কুমারকে বলল, এটাই আজ থেকে হবে তোমার বুনডি!

ডালিম কুমার মোরগটা পেয়ে দারুণ খুশি। কিন্তু বাবার সঙ্গে বোন ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিতেই মনটা তার

কষ্টে ভরে ওঠে। মন খারাপ করে বসে থাকল ঘরের কোণে। বিকেল বেলাতেও খেলতে গেল না। বাসায় সে আর ছোটো মামা। মামা বেড়াতে এসেছে দুদিন আগে। বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত মামা থাকবে। রাতে মামা ওকে আদর করে খাওয়াল। তাও ওর মন ভালো না। বোনের কথা ভাবতে ভাবতে রাতে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল।

একসময় তার চোখে স্বপ্ন এসে ভর করে। বোন জবাফুল ওর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে ডাকছে– ভাইডি, ও আমার সোনার ডালিম কুমার ভাইডি, ওঠ, উঠে মুখ-হাত ধুয়ে পড়তে বসো। সকাল হয়ে গেছে। সে স্বপ্নটা দেখতে-দেখতেই , হঠাৎ তার নতুন লাল মোরগটা বাক দিয়ে ওঠে– কুক্কুর-কু-কু..!

মোরগের ডাকে ডালিম কুমারের ঘুম ভেঙে যায়। দেখে সত্যিই তো ভোর হয়ে গেছে। তার মন ভালো হয়ে যায়। উঠে হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসে।

ডালিম কুমার মোরগটার নাম রাখে বুনডি। রোজ ভোরে বাক দিয়ে সে তার ঘুম ভাঙায়। বোন জবাফুলও রোজ ভোরে ডেকে ডেকে তাকে উঠিয়ে দিত। বুনডি বলে ডাকলেই মোরগটা ছুটে আসে। ডালিম কুমার ওকে খুদ-কণা খেতে দেয়। লাল চকচকে তার গায়ের রং। সকালের রোদে কেমন ঝিলমিল করে ওঠে। গলা ঝাঁকা দিলে সিংহের কেশরের মতো ফুলে ওঠে। সে যেখানেই যাক বুনডি ওর পেছন পেছন ছোটে। একদিন ওর সঙ্গে স্কুল পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এরপর থেকে ডালিম কুমার ওর দৃষ্টি এড়িয়ে খুব গোপনে স্কুলে যায়। পথের পাশে বন। হঠাৎ কোন দিন শেয়ালে ধরে নেয় সেই ভয়ও আছে।

মোরগ বুনডিকে পেয়ে ডালিম কুমার সত্যিই বোনের কষ্ট ভুলে থাকতে পারে। তাছাড়া বোন জবাফুল তো রোজ তিন-চারবার মোবাইলে কথা বলে। খাওয়া দাওয়া, পড়াশোনার খবর নেয়। আবার কোনো অংক বা ইংরেজি পড়া না বুঝলে মোবাইলেই বলে দেয়। আর তার মোরগ বুনডির হালচালও শোনে।

ঈদের ছুটি পড়েছে। বোন পরশু আসবে। ফোন পেয়ে ডালিম কুমারের খুশি যেন ধরে না। ডাক দেয় বুনডিকে। বুনডি..!

বুনডি কক কক করতে করতে দৌড়ে আসে ডালিম কুমারের কাছে। সে তাকে কোলে তুলে আদর করতে করতে বলে, বুঝলি বুনডি, আমার আর এক বুনডি পরশু দিন আসবে।

তো রাতে বোনের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে ডালু। আজ এত ঘুমুচ্ছে সে! ভোর হয়েছে সেই কখন। উঠোন জুড়ে রোদের ঝিলিমিলি। এখনো ঘুম ভাঙেনি। কী ব্যাপার! রহিমুদ্দির খেয়াল হতেই ডাক দেয় ছেলেকে– ডালিম কুমার.., এখনও তোমার ঘুম ভাঙেনি আজ? ওঠ বাজান!

বাবার ডাকে লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠেই সে ভাবে, তার মানে? আজ কি বুনডি বাক দেয়নি? সে দৌড়ে মোরগের খোপের কাছে যায়। খোপ তো খোলা। ডাকে বুনডি-বুনডি করে বেশ কবার। না বুনডির সাড়াশব্দ নেই। তাহলে কি শেয়ালে ধরল? এ-কথা ভাবতেই তার মন দুঃখে ভরে গেল। সে কেঁদেই ফেলল। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

বাবা ছুটে এল। সব শুনে সেও ধরে নিলো শেয়ালেই নিয়েছে বুনডিকে। এখন তো কিছুই করার নেই। ছেলেকে বলল, কাঁদিস না বাপ, আজ হাটবার। আর একটা লাল মোরগ কিনে দেবো তোরে।

কী যেন ভাবল ডালিম কুমার। বলল, না, আমার বুনডিরেই চাই! এই বলেই সে ছুট দিলো। বাড়ির এপাশ-ওপাশ খুঁজল। তারপর বাগানের দিকে গেল। সারা বাগান খুঁজল তন্নতন্ন করে। দুপুরে ফিরে এসে বলল, বাপজান, আমার বুনডিরে শেয়ালে নেয় নাই। নিছে মানুষে।

কি করে বুঝলি তুই? রহিমুদ্দি হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল। বলল, পাগল ছাওয়াল আমার, শেয়ালেই নিছে। আশপাশে সবাই আমাগের আপনজন। তোর মোরগ কে নেবে শুনি?

চোখের পানি শুকিয়ে ডালিম কুমারের গালে দাগ হয়ে আছে। সে কান্নাভেজা গলায় বলল, আমি তোমার সঙ্গে আজ হাটে যাবো। যে আমার বুনডিরে ধরে নিয়ে গেছে হাটে যদি সে তারে বেচতে আসে, আমি ঠিকই চিনতে পারব।

রহিমুদ্দি হাসে, বোকা ছাওয়াল কোথাকার! ঠিক আছে যাস। তবে, আমি তো কইলামই, আর একটা মোরগ তোরে কিনে দেবো।

মঙ্গলবারে নদীর ওপার বসে বড়গাছিয়া হাট। বাবার

সঙ্গে ডালিম কুমার হাটে গেল। আগেভাগেই পৌঁছাল। বাবা বলল, বাজার-সদাই কেনার পর সবশেষে তোর মোরগটা কিনব বুঝলি!

ডালিম কুমারের তর সয় না। বলে, তুমি অন্যসব কেনো, তবে আমি আগে যাবো মোরগের হাটে। এই বলে সে বটতলায় মুরগি বেচার জায়গায় ছুটল। ছেলের পেছন পেছন রহিমুদ্দিও না গিয়ে পারল না। তখনও মুরগিঅলারা তেমন এসে পৌঁছেনি। এক-এক করে আসছে। একটু দূরে দাঁড়ায় ওরা। যাতে ওরা মুরগিঅলাদের নজরে না পড়ে।

দেখতে-দেখতে জমে উঠছে বটতলা। লাল মোরগ একটাও আসেনি। হঠাৎ একজন একটা ঝুঁটিঅলা লাল টকটকে মোরগ এনে দাঁড়াল। ডালিম কুমার বলল, বাজান ওটাই তো আমার বুনডি মনে হচ্ছে। রহিমুদ্দিন হেসে বলল, পাগল ছাওয়াল. অমন লাল মোরগ তো কতোই আছে।

ডালিম কুমার বলল, না বাজান, ওটাই আমার বুনডি। আর ওই লোকটারেও চেনা-চেনা মনে হচ্ছে খুব।

দূর বোকা! ওটা অন্য মোরগ। আর ও-তো জোলাপাড়ার তোয়াক্কেল ব্যাপারির ছাওয়াল। ওর নাম মালু। যদিও ওর একটু বদনাম আছে, কিন্তু আমাগের মোরগ সে ধরতে যাবে না। ওরই ওটা। তো চল, ওটাই তোরে কিনে দিই।

বাজান, একটু থামো। একটু পরীক্ষা করি।এ-কথা বলেই ডালিম কুমার বটতলার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডেকে উঠল, বুনডি...!

মুহূর্তেই লালমোরগটা মালুর হাতে বাজপাখির মতো একটা ঠোকর দিয়ে কক কক করে ডাকতে-ডাকতে পাখির মতো উড়ে গিয়ে ডালিম কুমারের ঘাড়ে গিয়ে বসল।

হাটের লোকজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই মালু রক্তাক্ত হাত নিয়ে নাভিশ্বাসে ছুটে পালাল।

কী ব্যাপার...! ডালিম কুমারের চারপাশে লোকজনের ভিড় জমে উঠল।

রহিমুদ্দি ওদের বলল, ব্যাপার কিছু না! মানে, মোরগটা কাল রাতে চুরি হয়। তো আমার এই ছাওয়ালের পোষা তো! তাই সন্দেহ হয় ওর, ওটাই ওর বুনডি। তো বুনডি বলে ডাকতেই ঘটনা ঘটে গেল আরকি!

কয়েকজন এগিয়ে এসে বলল, ওর নাম মালুচোরা। যাও থানায় একটা মামলা করে দাও ওর নামে। একটা শাস্তি হওয়া দরকার ওর।

রহিমুদ্দি বলল, না-ভাই, যখন পাওয়া গেছে থাক। আর কেসজারিতে গিয়ে লাভ নাই। এই বলে রহিমুদ্দি আর বাজার-সদাই না করেই ফিরল বাড়ির দিকে। সঙ্গে ডালিম কুমার। তার কাঁধে বুনডি। ডালিম কুমারের প্রিয় বুনডি। ডালিম কুমার ভাবে, কাল ঢাকা থেকে বোন জবাফুল ফিরে যখন এ-ঘটনা শুনবে, কী মজাই না হবে তখন! ■

*মুবাশশির আহমেদ কাদির*
*সপ্তম শ্রেণি, স্কলারস স্কুল অ্যান্ড কলেজ*
*ধানমন্ডি, ঢাকা*

গল্প

# নেপাল সাধু ও জলদেবতা

## দিলারা মেসবাহ

ছোট্ট বন্ধুরা, ভরা এক গ্লাস পানি ঢকঢক করে খেয়ে নাও। ও পানি তো পান করতে হয়, নয় কি? হ্যাঁ, পান করেছ তো! এবার লক্ষ্মী হয়ে বসো। বাদল মামা মানে টাকু মামার কথা বলছি।

অল্প বয়সে তার মাথা জুড়ে পড়েছে টাক! সে যাক বাদল মামার তুলনা বাদল মামাই। এই তো সেদিন ভরা বর্ষায় গিয়েছিলাম মামা বাড়ি বগুড়ায় সারিয়াকান্দি। দিনকয় আমার বুবুজির চুলার আগুন আর নেভার জো নেই। ভুনা খিচুড়ি, ল্যাটকা খিচুড়ি, ইলিশ-ভাপা আরো কত কী! পিঠা পুলিও ছিল বটে। কিন্তু আমি তো দারুণ অভিযানের আশায় উসখুস করছিলাম। খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমাচ্ছি। রাত পোহালে সেই খাচ্ছি দাচ্ছি। এতে তো আমার পোষাবে না।

ভর দুপুর বেলা। সেই মজাদার খাচ্ছি দাচ্ছি। নানিমার হাতের পাবদা মাছের রসা রান্না। গরম ভাত। চিংড়ি মাছের ভর্তা। কম খেয়ে পস্তাবো নাকি? খেলাম ভরপেট। দুপুরের ভাদ্রমাসী রোদ আস্তে আস্তে মিইয়ে আসছে। বাদল মামা ঘোষণা দিলেন, খোকাবাবু রে, তৈরি থাকিস। ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ব। চরে নৌকায় করে যাব যমুনায়। আরো অনেক কিছুর অভিযানে। আমার হৃদযন্ত্র মহানন্দে লাবতুম করে তুর্কি নাচন শুরু করেছে। বেশি খুশি হলে আমার আবার চোখের কোণা ভিজে ওঠে। মামাকে লুকাতে চওড়া বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বাগানের জবা, বাগানবিলাস, মধুমঞ্জুরি আমাকে দেখে হেসে লুটোপুটি।

ফুটি ফুটি ভোরবিহানে কালিতলা ঘাট থেকে ভাড়া মিটিয়ে একটা নৌকায় চড়ে বসলাম। চারপাশে নৌকা

আর নৌকা। অন্তত গোটা পঞ্চাশেক নৌকা ভিড়ে আছে। যমুনার এই এলাকায় নদী ভাঙনের বিরাম ছিল না। নদী-ভাঙা মানুষগুলোর কেউ কেউ একরোখা, রুক্ষ হয়ে ওঠে। মামার কাছে শুনেছি ওদের কেউ কেউ ডাকাত বনে যায়।

নৌকা চলছে। যমুনার জলে দক্ষ হাতে বৈঠা বাইছে দুই মাঝি। মাথায় বাঁধা লাল গামছার কিনার উড়ছে বাতাসে প্রজাপতির পাখনার মতো। ছপ্ ছপ্ ছপ্ শব্দ হচ্ছে। দারুণ জল ভ্রমণ।

বৈঠা বাইতে পরিশ্রম হয় বটে। একজন মাঝির নাম শিকারু। যমুনার চরে পাখি শিকারে তার জুড়ি নেই। তাই নাম হয়েছে শিকারু। আরেক মাঝির নাম ঠান্ডু মিয়া। সে খানিক ঠান্ডাই বটে।

মামা গল্প জুড়ে দিলেন শিকারুর সঙ্গে, এখানে ডাকাতি হয় নাকি মাঝি ভাই?

শিকারু নির্বিকার জবাব দিলো, হয়ত। সেদিনকাই হলো।

কারা করে শিকারু ভাই? প্রতি উত্তর, হামরাই করি, হামাকের ভাইয়েরা করে।'

নৌকার ওপার থেকে ঠান্ডু মিয়া অভয় দিলো, হামাকের নৌকাত উঠলে আর ভয় নাই। ততক্ষণে নৌকার গলুইয়ে আমি হাত পা এলিয়ে বসে পড়েছি। সমূহ বিপদের ভয়ে।

আমরা যমুনার মাঝ বরাবর এসে পড়েছি। নতুন জাগা এক চর দেখা গেল। চর জুড়ে হাঁটু সমান ঘাস আর ঘাস। থৈ থৈ করছে। কিছু বরুয়া পাখি এদিক সেদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। মামা দেখালেন দূরের কালো রেখার দিকে আঙুল দিয়ে, ওটা মাদারগঞ্জ, জামালপুর জেলা।

আমার বিজ্ঞ মামা এবার খানিক ভাব ধরলেন। তারপর ইতিহাসের পাতা উলটালেন। শোন ভাগ্নে, আঠারো শতকে এ অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়। সে সময় দুর্গম চরে শাহ মাদার নামে একজন ধর্ম প্রচারক আস্তানা গাড়েন। তাঁর শিষ্যদের বলা হতো মাদারি ফকির। বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা মজনু শাহেন অনুগামী ছিলেন মাদারি ফকিরেরা। এই বিদ্রোহ উড়ে এসে জুড়ে বসা ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে।

আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি। বাদল মামার সঙ্গে একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে এ্যাডভেঞ্চারের থলেতে সোনা রূপা টাপুর টুপুর পড়তে থাকে।

তাকিয়ে আছি যতদূর চোখ যায়। হঠাৎ দেখি একটা লাল জাহাজ ভাসছে যমুনার জলে। জানা গেল এটি শুধুই লালরঙা জাহাজ নয়। এটি একটি ভাসমান হাসপাতাল। তিনটি ছইতোলা ইঞ্জিন নৌকা সাদা ধবধবে বড়ো একটা বোট, দুইটা হাউস বোট ভাসছে লাল জাহাজটার পাশে। চরের পাড়ে মুদির দোকান আর অনেকগুলো টিনের ঘর-দুয়ার। এখানে দূর-দূরান্ত থেকে হতদরিদ্র রোগীরা আসে। লাল জাহাজের চিকিৎসা নেয়। সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রামের রৌমারীর চরে আর গাইবান্ধায় এরকম ভাসমান হাসপাতাল আছে।

মামা মুদি দোকানি রোগা মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে ডাকাতি হয়? মহিলাটি পান চিবুতে চিবুতে বললেন, হামাকেরে আছেইবা কী, নিবিই বা কী? লালজাহাজ যতদিন ভাসে, ততদিন দোকান, তারপর আর নাই।

আমরা ফিরে চলেছি কালিতলা ঘাটে। দুপুরে বুবুর হাতের তেলের পিঠা খেয়েছি। যমুনা জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ। চারদিকে সন্ধ্যা নামছে। থমথমে বাতাস। যেন কিছু বলতে চায়। আরো কিছু গোপন কথা! রহস্য কথা!....

সারিয়াকান্দি বাজারে দেখা মিলল প্রাচীন এক দোতলা দালানের। ইট সুরকি খসে খসে পড়ছে। কিছু গ্রাম্য মানুষের জটলা। চায়ের দোকান। সেখানেই দর্শন পেলাম এক আজব মানুষের। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। দাড়ি গোঁফে সয়লাব এক আজব মানুষ। এত লম্বা দাড়ি আমি আগে কখনো দেখিনি। আলুথালু গোঁফে ঢাকা ভাঙাচোরা তামাটে মুখ। কেমন করে ভাত খায় ভাবছিলাম। এই আজব মানুষটি নেপাল সাধু। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। পরনে জামা হাতে কাঁসার ঘটি। সাধু কথা কন না কারো সাথে!..

চা-দোকানি আদ্যপান্ত জানালেন সাধুর জীবন কথা। কোনোকালে এই কালো থৈ থৈ যমুনার জবরদস্ত জেলে ছিলেন। যমুনার তল, রং, তার ঢেউগুলো আর মাছেদের চলাচল সব যেন ছিল তার মুখস্থ। জেলে কুলের দেবতা ওস্তাদ মানুষ। এক দুই মণ ওজনের বাগাড় মাছ, কালবাউশ,মহাশোল অনায়াসে জালবন্দী করতেন। সে সব রাঙতামোড়া দিন ছিল সাধুর। পেটা শরীর, চোখভরা সাহসের আগুন।

রঞ্জ মাঝি আরো গল্প শুনালেন, শাওন মাসের একদিন বিহানে সাধু নদীতে গ্যাছেন মাছ ধরবার। সেদিনকা ওনাক নাকি নদী টান্যা ছিনল। তো নাই নাই। তিনদিন পর সাধু পানি থ্যাকা উট্যা আলেন। সাথে ম্যালা কাঁসার বাসনকোসন। কিন্তু কুনটি ছিল কী যে দেখছিল, সেইটা আর কয় না।'

মিজু জেলে বলল, এখানে এই যমুনার জলের তলে জল-দেবতার বসত। তারাই নাকি নৌকাডুবি করায়। যাত্রীবোঝাই লঞ্চগুলো উলটে দেয়। জল দেও ভয়ংকর। পাইন্যা ভূতেরা এ অঞ্চলে শিশু।

মামা চিনিচম্পা কলার ফানা, গরুর দুধের এক গ্লাস ধোঁয়া ওঠা চা সাধুর সামনে ধরে কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগলেন, সাধুবাবা একটু মুখে দ্যান। আমরা আপনার আনে বেড়াতে আসছি। আপনার সাথে একটু কথাবাত্তা না কয়ে যাই ক্যামনে?

সাধু কাঁসার ঘটিটি নামিয়ে তীব্র চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। চোখ দুটো যেন জল-দেওয়ের রেডলাইট! হঠাৎ চায়ের গ্লাসটা টেনে নিয়ে কয়েক চুমুক দিলেন। ব্যাজার ভাবটা খানিটা উঠে গেল যেন! মামা সাহস করে বললেন, আর মাছ ধরতে যান না কেন?

সাধু মাটির দিকে তাকিয়ে কত কী যেন ভাবলেন। এক সময় ধ্যানমগ্ন অলীক মানুষের মতো বললেন, তা কব্যা পারমু না। হামাক মানা করছিল।

মামা ব্যাগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কে মানা করছিল? জবাব নেই। নিশ্চুপ নেপাল সাধু। পাশ থেকে রঞ্জমাঝি বলে উঠল, এতগুলান বছর গেল, কেউ ওনার মুখ থ্যাকা এ্যার জবাব লিবার পারেনি ভাই।

আরো জানালাম ভূতে পাওয়া এই মানুষটি আশপাশের গ্রামগুলোতে হেঁটে হেঁটে কী যেন খোঁজেন। কোনো রকম যান-বাহনে চড়েন না। ভক্তরা টাকা পয়সা দেয় কিছু। অথচ এই সাধু তাঁর তিরিশ বিঘা জমিন গরিব বর্গাচাষীদের দান করে দিয়েছেন। তাঁর ছেলেদের জেলে-জীবন শেষ হয় নাই। কখনো যমুনার গভীরে তাদের জাল আটকে যায়। বাপকে পায়ে ধরে যমুনায় নিয়ে আসে। বৃদ্ধ একদমে যমুনার গভীরে ডুবে জাল ছাড়িয়ে আনেন।

এইবার আমি সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কে নিয়ে গিয়েছিল পানির তলে? সাধুবাবা।

সাধু বিপুল আকাশের দিকে চেয়ে খানিক শ্বাস টেনে নিলেন। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, হামার পিঠত খামচা দিয়া লিয়া গেল পানির তলাত্।

এরপর আনমনা নেপাল সাধু মুখ একবারে কুলুপকাঠি এঁটে দিলেন। রহস্যমানব এক সময় হাঁটা দিলেন তাঁর থানের দিকে। ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটছেন। শুধু কী বয়সের ভারে? বস্তাবন্দি অনেক না বলা রহস্য কথার ভারেও। যমুনার দীঘল জলকণায় যে রহস্য প্রতিদিন ঢেউ ভাঙে। ■

# রহস্যময় স্থাপত্য

**খালিদ বিন আনিস**

হাজার হাজার বছর আগের মানব সভ্যতার অনেক বিষয়ই এখনো মানুষের জানা হয়ে ওঠেনি। সে-সব নিয়ে যেমন রহস্য রয়েছে, তেমন রয়েছে নানা উপকথাও। যা রহস্যের মাত্রা শুধু বাড়িয়েছেই!

এবার জেনে নাও এরকম এক স্থাপনা সম্বন্ধে।

**নান মাদোল**

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অজানা রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট্ট এক দ্বীপ। নামও শুনতে ভয়ংকর.. 'নান মাদোল'। যেন ভয়ানক কোনো মাদলের নাম এটি! যদিও নামটির স্থানীয় অর্থ হচ্ছে 'মধ্যবর্তী স্থান'। মাইক্রোনেশিয়ার পনফেই দ্বীপের পাশে অবস্থিত ছোট্ট এই দ্বীপকে এড়িয়ে চলেন খোদ স্থানীয়রাই। তাদের দাবি, এই দ্বীপে মানুষ থাকে না। কোনো মানুষ সেখানে যাক, তাও চায় না দ্বীপের রহস্যময় প্রাণীরা।

আদতে ওই দ্বীপে কোনো মানুষের বসবাস তো দূরে থাক প্রাণীও নেই! কিন্তু রয়েছে প্রাচীন সব স্থাপনা।

প্রাচীন স্থাপনাগুলো দেখতে কিন্তু আধুনিক। তবে কারা এসব বানিয়েছিল তা আজও অজানা! স্থানীয় পনফেইয়ের বাসিন্দাদের কাছে এটি 'ভূতুড়ে দ্বীপ' হিসেবেও পরিচিত।

অস্ট্রেলিয়া থেকে ১ হাজার ৬শ' মাইল এবং লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ২ হাজার ৫শ' মাইল দূরে অবস্থিত দ্বীপটির পথও চরম দুর্গম। ফলে দীর্ঘদিন আধুনিক সভ্যতার পা পড়েনি। বলতে গেলে অনেকটা দুর্ঘটনাবশত দ্বীপটির সন্ধান পান অভিযাত্রীরা।

পথ দুর্গম হওয়ার কারণ হচ্ছে, এই দ্বীপে ৯৭টি আলাদা আলাদা ব্লক রয়েছে। যার দেয়াল ২৫ ফুট লম্বা আর ১৭ ফুট চওড়া। এই পাথুরে ব্লকের মাঝ

দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেকগুলো সরু খাল। মাঝ সমুদ্রে থাকা দ্বীপটির পথকে দুর্গম করতেই এমন ব্যবস্থা বলে মত দিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা।

রহস্যময় দ্বীপটিতে রয়েছে পাথর আর প্রবাল দিয়ে তৈরি অসাধারণ সব প্রাচীন স্থাপনা। কিন্তু কারা এবং কেন এই দ্বীপে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সে সম্পর্কে কিছুই জানে না আধুনিক বিজ্ঞান। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, ১১৮০ সালের দিকে 'নান মাদোল'-এ শহর তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। যা রহস্যময় কারণে আর আগায়নি।

তবে এই যুক্তি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বিতর্ক আছে দ্বীপটিতে নাকি দিনের বেলা যেমন-তেমন রাতে শুরু হয়ে যায় এলাহি কাণ্ড। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় রাতেই তারা দ্বীপটিতে রহস্যময় আলো দেখতে পান। অজানা শব্দও শোনা যায় সেখানে।

প্রাণহীন ওই দ্বীপে সাহসী অভিযাত্রীরা দিনের বেলায় গেলেও, রাতে কেউ থাকার সাহস দেখান না। কথিত আছে, যারা ওই দ্বীপে রাতে অবস্থান করেছেন, পরদিন তাদের আর সন্ধান মেলেনি। এলিয়েন বিশ্বাসীরা মনে করেন, রহস্যময় নান মাদোলে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের আগমন ঘটেছিল। সম্ভবত এখনো সেখানে তাদের যাতায়াত রয়েছে। দ্বীপটির রহস্যময় স্থাপনার পেছনেও হাত রয়েছে তাদেরই! ■

## কবিতার হাট

### শীতকাল

**মেহেদা আক্তার মামণি**

শীতের দিনে খেজুর গাছে
হাঁড়ি ভরা রস
ভাবছি বসে খাব পেড়ে
দুষ্টুমির বয়স।

বারোমাসে ছয় ঋতুতে
দেশে আসে শীত
চাদর গায়ে জড়িয়ে রোজ
বসে গল্পের গীত।

সরষে ফুলে শীতের আভাস
শিশির ঝরা ভোরে
মিষ্টি মধুর শীতের পিঠা
থাকি সুখের ঘোরে।

*নবম শ্রেণি, মানিকগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়*

### শীতের পিঠা

**আবির হোসেন**

শীতকালে পিঠা খেতে
লাগে মজা ভারি

গরম গরম পিঠা নিয়ে
ভাইবোনের চলে কাড়াকাড়ি।

দাদা দাদি সবাই মিলে
চলে গল্প আর পিঠা খাওয়া
নানান স্বাদের পিঠাপুলি
এই শীতে যায় যে পাওয়া।

*৭ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।*

## রূপার ইলিশ

মাকিদ হায়দার

ইলিশের দাম শুনে মাথা গেল ঘুরে
তাই শুনে কালো কাক হাসা মাখা ঠোঁটে
তাকাল করুণ চোখে ইলিশের দিকে।
ইলিশেরা দশ ভাই ছিল মহা সুখে
নদী ছেড়ে ঢাকা এসেছিল পাশাপাশি
মাঝখানে বোকাসোকা
দুই ভাই ছিল চুপচাপ,
আট ভাই নিজেদের দাম শুনে
সারারাত করে হাসাহাসি
উড়ে এল সাদা মেঘ, সাথে কালো চিল
সেই সনে হেঁটে এল ইলিশের ঝাঁক
কেউ আর কিনল না ইলিশের ডিম
চারিদিকে চেয়ে দেখ ফাঁকা মতিঝিল।
ইলিশের দাম শুনে আমি কুপোকাত
পায়ে হেঁটে, ভয়ে ভয়ে
সেই রাতে যাই রংপুরে।

## আকাশের ছবি চোখে

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

শুভ দিনে আলো হাসে
ঝলোমলো আলো
সুখে সুখে দিন যায়
দূর হয় কালো।
পাখি যায় দল বেঁধে
দূর থেকে দূরে
চারদিক ফরসা যে
সুখে মন ঘুরে।
আকাশের ছবি চোখে
কত আশা জাগে
ভুলে সব দুঃখ ভয়
হাসিখুশি ভাগে।

.

ঝলমল রয় তাই
আকাশেতে চাঁদ
ভাবনাতে রয় খোকা
মন ভরা সাধ।

## শীতের ছড়া

আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক

শীত এসেছে মিষ্টি সকাল, রোদ পোহানোর ধুম
শীত এল তাই দুপুর বেলায় একটুখানি ঘুম।
শীতের সকাল পিঠার মেলা, খেজুর রসের হাঁড়ি
লেখাপড়া শীত নিদ্রায়, আমরা মামার বাড়ি।
শীতের বাতাস- ভীষণ কাঁপন লাগল সারা গায়
অলস বিকেল- ফুলের সুবাস আলতো ছুঁয়ে যায়।
রাতের শিশির ঘাসের বুকে আলোয় মাখামাখি
বাঁশ বাগানে উদাস ডাকে নাম না জানা পাখি।
জোছনা-ভেজা কুয়াশাতে হাজার তারার মেলা
নিশুতি রাত- মায়ের মুখে স্বপ্নপুরির ভেলা।

*শ্রেয়সী শংকর কুন্ডু, ৩য় শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা*

গল্প

# একদিন এক কাজল

## আহমেদ রিয়াজ

দলটা ফিরছিল স্কুল থেকে। ছয়জনের দল। দলের পাঁচজন আগে আগে। একসাথে। কেবল একজন পিছনে। কাজল।

প্রতিদিনই এমন হয়। ছুটির ঘণ্টা বাজলেই হলো। একছুটে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসে ওরা। তারপর আরেক ছুটে বাড়ি। ঘরে বইখাতা রেখে শেষবার ছুট দেয়। এই ছুটে মাঠে। মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলে। তবে ওদের সঙ্গে ছুট দিতে পারে না কাজল। কোনোদিন পারেনি।

কাজলকে কেউ খেলায় নিতে চায় না। নেবে কী করে। ও কী ব্যাটিং করতে পারে? কেউ জানে না।

ও কী বোলিং করতে পারে? সেটাও কেউ জানে না। কারণ ও দৌড়াতেই জানে না। প্রতিদিনই ওকে আম্পায়ার বানায় সবাই। অবশ্য এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ও। কাজলের কিন্তু অনেকদিনের ইচ্ছে ব্যাটিং করবে। বোলিং করবে। কিন্তু চাইলেই তো আর হয় না।

সবার পিছনে পা টেনে টেনে হাঁটছিল ও। সবার মতো হাঁটতে পারে না ও। কবে থেকে যে পারে না, জানে না ও।

দলের সবাই ততক্ষণে অনেক সামনে চলে গিয়েছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কাজল। চিৎকার করে ডাকল, 'অ্যাই দেখে যা'।

কেউই পিছনে ফিরে তাকাল না। কেউ কি শুনতে পায়নি? নাকি ওর ডাকে সাড়া দিচ্ছে না? হতে পারে।

আবারও হাঁক দিল কাজল, 'জলদি দেখে যা।'

নাহ। সাড়া দিল না কেউ। ততক্ষণে ওরা আরো অনেক দূরে চলে গেছে। এখন আর হাঁক দিয়েও লাভ নেই। শুনতেই পাবে না।

পথ থেকে সরল না কাজল। পথটা বাঁধের উপর। পথের দুপাশে সারি সারি গাছ। বড়ো বড়ো গাছ। আট বছর আগে গাঁয়ের সবাই মিলে তৈরি করেছে বাঁধটা। না করে উপায় ছিল না। প্রতি বছর বানের

*আজমেরী সুলতানা*
*অষ্টম শ্রেণি, ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা*

পানিতে ভেসে যেত গ্রাম। ঘরবাড়ি ডুবে যেত। আবছা মনে আছে কাজলের।

তখন ও ছোট্ট ছিল। ছোটাছুটি করত সারাদিন। স্কুলে যাওয়ার বালাই ছিল না। ভয়ানক বন্যা দেখেছিল সে-বার। ওদের ঘরও ডুবে গিয়েছিল। পানি উঠেছিল একেবারে চালা পর্যন্ত। চালার উপর দিন কয়েক কাটিয়েছিল ওরা।

এখন এই বাঁধের কারণে কয়েকটা গ্রাম বন্যা মুক্ত।

তবে বাঁধের ওপারে খুবই খারাপ অবস্থা। কয়েক গ্রাম ভেসে গিয়েছে বানের জলে। ওসব গ্রামের সব মানুষ বাড়িছাড়া। আহা! কী কষ্ট তাদের। ভাগ্যিস বাঁধটা ছিল। নইলে এ পাড়েও হু হু করে বানের পানি ঢুকে পড়ত।

ততক্ষণে পাঁচজনের দলটা চলে গিয়েছে মাঠে। কিন্তু খেলা শুরু হতে দেরি হচ্ছে। আম্পায়ার ছাড়া কেউ খেলা শুরু করতে চাইছে না। কাজল খুব ভালো আম্পায়ার।

হাশিম ভাই বললেন, 'কাজলটা আসতে এত দেরি করছে কেন? যাও তো, একজন গিয়ে দেখে এসো।'

কে যাবে? জামালই বেরিয়ে পড়ল কাজলের খোঁজে।

প্রথমেই গেল কাজলের বাড়ি। নেই।

'কোথায় থাকতে পারে? স্কুল তো ছুটি হয়ে গেছে সেই কখন! আমরা একসঙ্গেই বেরিয়েছি স্কুল থেকে।'

'তাহলে কোথায় গেল কাজল?'

'আমি খুঁজে দেখছি খালাম্মা।'

বলেই চলে এল জামাল। এবার গেল বাঁধের উপর।

কিন্তু কাজলকে তো দেখা যাচ্ছে না। হাঁক দিল জামাল, 'কাজল!' 'কাজল!' দুবার।

সাড়া নেই।

এবার দুই মুঠি একত্র করে মুখের সামনে আনল। তারপর খুব জোরে হাঁক দিল, 'কা-জ-ল!'

বলেই চুপ করে কান পাতল।

আরে! ওই তো! কাজলের গলা না? কিন্তু কাজল কোথায়? বাঁধের এ পাশে তাকাল জামাল। নাহ। কাজলকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় কাজল? কিন্তু কাজলের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে ও।

একছুটে বাঁধের ওপাশে গেল জামাল। আরে! ওই তো কাজল।

আরেক ছুটে পৌঁছে গেল কাজলের কাছে। আর গিয়ে দেখল, বাঁধের একটা জায়গায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে কাজল।

অবাক হয়ে জানতে চাইল জামাল, 'এখানে কী করছিস? ওদিকে আমরা...'

পুরোটা বলতে পারল না জামাল। ওকে থামিয়ে কাজল বলল, 'শিগগির গ্রামে গিয়ে সবাইকে খবর দে।'

কথাটা শুনেই জামালের চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল। 'কী হয়েছে!'

'বাঁধে একটা ছিদ্র। শিগগির যা।'

পড়িমরি করে ছুটল জামাল।

বাঁধে ছিদ্র, কী ভয়ংকর কথা! মনে হলেই মনে পড়ে কষ্টের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল গাঁয়ের মানুষ। কেউ বালির বস্তা নিয়ে। কারো হাতে বাঁশ। কারো হাতে পাথর। কেউ এনেছে কাঠের গুঁড়ি। সবাই মিলে বাঁধের ছিদ্র বন্ধ করে দিল।

ভাগ্যিস বাঁধের ছিদ্রটা কাজল দেখতে পেয়েছিল। দেখতে পেয়েই পিঠ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল। নইলে পানির তোড়ে ছিদ্রটা বড়ো হতে হতে, এক সময় বাঁধটাই ভেঙে যেত। ডুবে যেত এ পাশের সব গ্রাম। তারপর...

তারপর কী হবে, সেটা আর কেউ মনেই আনতে চায় না। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

হাশিম ভাই বোঝাতে চাইলেন, দ্যাখ কাজল, ব্যাটিং করলে দৌড়ে রান নিতে হয়। তুই কি দৌড়ে রান নিতে পারবি? রানআউট হয়ে যাবি না?'

কাজল বলল, 'দৌড় না দিয়ে রান নেওয়া যায় না বুঝি?'

অবাক হলেন হাশিম ভাই। চোখ দুটো কপালে তুলে দিয়ে বললেন, 'কীভাবে?'

মুচকি হেসে জবাব দিল কাজল, 'চার-ছয় মরে।'

বলেই ব্যাটটা হাতে নিয়ে স্ট্যাম্পের সামনে এসে দাঁড়াল কাজল। আজ ও ব্যাটিং করেই ছাড়বে। ■

## আমার কিছু কথা আছে

মানুষ হওয়া কাকে বলে? এক একজন একেক রকম করে বলে, মানুষ হও, মানুষ হও। বল তো নবারুণ, আমি কেমন মানুষ হব?

- নূর সিদ্দিকী, সপ্তম শ্রেণি, চকপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

**নবারুণ**: বিশাল প্রশ্ন! মানুষ পৃথিবীতে এসেছে লাখো বছর হলো। সেই তখন থেকেই চেষ্টা করছে মানুষ হয়ে ওঠার। কেননা, মানুষের শরীর নিয়ে জন্ম নিলেই মানুষ হওয়া যায় না। সত্যিকার অর্থে, মানুষ হতে হলে কারোর কোনো ক্ষতি করা যাবে না। আমাদের সমাজে একেক ভাবে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। এ নিয়ে নিচের লেখাটা তোমাকেই উৎসর্গ করলাম। পড়ে দেখ তো, মানুষ হওয়ার কোনো উপায় পাওয়া যায় কী না।

# মানুষ হতে চাই

**মীম নোশিন নাওয়াল খান**

মেয়েদের মতো হাতে চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকো।
ছেলেরা কাঁদে না।
মেয়েদের মতো ন্যাকামি কোরো না।
মেয়েদের মতো কথা বোলো না।
মেয়েদের মতো এত হাসলে ব্যক্তিত্ব থাকে না।
মেয়েদের মতো এত ননীর পুতুল কেন তুই?

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে খুব পরিচিত কতগুলো বাক্য। এই বাক্যগুলো নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।

পরিচিত একজনের ছেলে হয়েছে। একদম নিউ বর্ন বেবি। ক্ষুধায় কাঁদছে। তাকে কোলে নিয়ে শান্ত করতে গিয়ে একজন বলল, কাঁদে না বাবা, ছেলেরা কাঁদে নাকি?

জন্মের পর মাকে চিনতে শুরু করার আগে থেকেই আমরা আমাদের ছেলেদেরকে শেখাই: ছেলেরা কাঁদে না!

তখনও বাচ্চাটা ওই কঠিন কথাগুলোর তো দূরে থাক, কোনো আওয়াজেরই অর্থ বুঝতে শেখেনি!

আস্তে আস্তে ছেলেটা বড়ো হয়। পছন্দের খেলনাটা ভেঙে গেলে কেঁদে ফেলে। খেলার মাঠে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কেঁদে ওঠে। প্রথমবার স্কুলে গিয়ে বাবা-মাকে ছেড়ে ক্লাস করতে হবে ভেবে কেঁদে ওঠে।

প্রতিবারই আমরা বলি, ছি বাবা! ছেলেরা কাঁদে নাকি?

আমরা বুঝতেও পারি না, কীভাবে ধীরে ধীরে ছেলেটার মধ্যের মানুষটাকে আমরা মেরে ফেলছি। মানুষ মাত্রই তার আবেগ আছে। শুধু সুখ না, দুঃখও আছে। আর কান্না সেই দুঃখেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু আমাদের মতে, ছেলেরা দুঃখ পাবে না। তাদের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট নামক অনুভূতিগুলো থাকবে না। তারা কাঁদবে না। অনুভূতি না থাকলে কেউ মানুষ হয় না।

আর তাই হয়ত আমাদের ছেলেগুলো আস্তে আস্তে অমানুষ হতে শুরু করে। রাস্তায় একটা মেয়েকে লাঞ্ছিত হতে দেখলেও তারা আর প্রতিবাদ করে না। বরং দৃশ্যটা উপভোগ করে।

কেন? কারণ আমরা তাকে অমানুষ বানিয়েছি। সে আর এখন একটা মেয়েকে অপমানিত হতে দেখে, লাঞ্ছিত হতে দেখে কষ্ট পায় না। ছেলেদের তো কষ্ট পেতে নেই!তাদের তো খারাপ লাগতে নেই। এই শিক্ষা তো আমরাই তাকে দিয়েছিলাম, তাই না?

আমার ছোটো ভাই পাহাড়ি রাস্তায় হোঁচট খেয়েছিল বলে একজন তাকে বলেছিল, মেয়েদের মতো এত নরম হলে চলবে?

পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়ে একটা ছেলে 'উহ' করলে কিংবা পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে না পারলে আমরা বলি,

‘মেয়েদের মতো ননীর পুতুল হয়েছিস একটা!’

সম্ভবত এই কারণেই আমাদের ছেলেদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মায়, মেয়েরা ননীর পুতুল। তারা দুর্বল। তাদেরকে যাই বলা হোক, তারা কিছু করতে পারবে না।

আর এভাবেই আমাদের ছেলেগুলো একদিন মেয়েদেরকে উত্যক্ত করতে শিখে যায়। স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে শিখে যায়।

মেয়েরা ননীর পুতুল যে! তারা তো কিছু বলতে পারবে না। আমরাই তো আমাদের ছেলেদেরকে এটা শিখিয়েছিলাম, তাই না?

একবার এক সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা মানুষ একজনের ব্যাপারে আমাকে বলেছিল, তোমার অমুক আংকেল তো মেয়েদের মতো হাতে চুড়ি পরে বসে থাকে।

আমাদের ছেলেরা কোনো একটা কাজ ঠিকভাবে করতে না পারলেই আমরা বলে ফেলি, কিছুই তো পারিস না। মেয়েদের মতো চুড়ি পরে ঘরে বসে থাক, যা!

নিজেদের অজান্তেই আমরা আমাদের ছেলেদেরকে শেখাই, মেয়েদের কাজ চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকা। ঘরের বাইরের কোনো কাজ তারা পারে না।

এরপর যদি আমাদের ছেলেরা তাদের স্ত্রীদেরকে প্রশ্ন করে, ‘সারাদিন তো ঘরেই বসে থাকো। করোটা কী?’

কিংবা যদি একটা মেয়েকে স্কুটি চালাতে দেখে মন্তব্য করে, মাইয়া মানুষ ঘরে থাকবে। এইগুলা চালানো মাইয়া মানুষের কাম নাকি?

তাহলে কি সেই দোষ আমাদের নয়? আমরাই তো তাকে শিখিয়েছিলাম, মেয়েরা চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকবে, তাই না?

আমার এক বান্ধবীর ছোটো ভাই একটি সুইট ছবি দেখে বলেছিল, কী কিউট!

সাথে সাথে আমার আরেক বান্ধবি বলেছিল, কিউট? তুই কিউট বলছিস কেন? এটা তো মেয়েরা বলে! তুই কি মেয়ে?

টেডি বিয়ারকে জড়িয়ে ধরা একটা ছোট্ট বাচ্চার চমৎকার একটা ছবি দেখে যদি কোনো ছেলে বলে, ‘কী কিউট! হাউ সুইট!’

আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলি, মেয়েদের মতো কথা বলছিস কেন? হিজড়া নাকি তুই?

ঠিক এভাবেই নিজের অজান্তেই আমরা আমাদের

ছেলেদের মধ্যে থেকে কোমল, সুন্দর দিকগুলো নষ্ট করে ফেলি।

তারপর একদিন একটা মানুষের সঙ্গে গেঁথে নেয়া জীবনে একটা ছেলে যদি খুব আনরোমান্টিক হয়, সেই দোষ কি তার? আমরাই তো তাকে শিখিয়েছিলাম, ছেলেরা সুইট কথা বলবে না, সুইট কাজ করবে না!

এক বন্ধুর সাথে কথা হচ্ছিল। তাকে বলছিলাম, তুই খুব সুন্দর করে হাসিস। কিন্তু খুব কম হাসিস।

সে উত্তর দিল, ছেলেরা বেশি হাসলে ব্যক্তিত্ব কমে যায়।

না, এই দোষ তার না। এটা তাকে আমরাই শিখিয়েছি। একটা ছেলে খুব হাসিখুশি প্রাণবন্ত হলে আমরাই তো বলি, ছেলেদের এত হাসতে হয় না। ছেলেদের মধ্যে থাকবে গাম্ভীর্য, ভারিক্কি চাল। মেয়েদের মতো এত হাসলে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

শুধু এটুকুই না, আমরা ছেলেদেরকে আরো শেখাই, বেশি হাসা ছেলেদেরকে নাকি পুরুষ মানুষ মনে হয় না। আর তাই মেয়েরা তাদেরকে পছন্দ করে না!

আমরা এই শিক্ষা দিই বলেই তো আমাদের মেয়েরা ছোটো থেকে শুনে শুনে বড়ো হয়, বেশি হাসা ছেলেরা সত্যিকারের পুরুষ মানুষ না। তাদেরকে পছন্দ করা যাবে না! আর আমাদের ছেলেরা শেখে, হাসা যাবে না! এই দায় কি তাদের?

খেয়াল করলে দেখবে, মাদকাসক্তির হার মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে বেশি। কেন?


## নবারুণ পড়

**ওয়েব সাইট:** www.dfp.gov.bd

**ফেসবুক:** nobarun potrika

**মোবাইল অ্যাপ:** Google Playstore থেকে 'Nobarun' Install করো।

বিকাশ ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে গ্রাহক চাঁদা দিলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে নবারুণ।


আমার মনে হয়, তার অন্যতম কারণ, মেয়েরা ডিপ্রেসড থাকলে কাঁদতে পারে। পরিবারের সাথে না হোক, বান্ধবিদের সাথে নিজের পরিস্থিতি শেয়ার করে হালকা হতে পারে, পরামর্শ নিতে পারে।

কিন্তু ছেলেরা ডিপ্রেসড হলে কাঁদতে পারে না। ছেলেদের কাঁদতে নেই যে! বন্ধুদের সাথে শেয়ার করা? বন্ধুরা বলবে না, ছেলেরা কাঁদে নাকি? কানতেছিস ক্যান?

ওইটুকু একটা বুক কি এত ডিপ্রেশনের ভার নিতে পারে? ডিপ্রেশনের ভারের ভাগ নেয়ার জন্য ছেলেটাকে তখন সিগারেট আর অ্যালকোহলের কাছে যায়। যা কখনোই উচিত নয়।

আমাদের সমাজে অনেক সমস্যা। তার মধ্যে অনেক বড়ো একটা সমস্যা, জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন। কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা এসির বাতাস খেতে খেতে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের বিপরীতে আলোচনা করি, অথচ আমরাই প্রতিনিয়ত জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন শেখাই পরবর্তী প্রজন্মকে।

একটা ছোট্ট শিশু জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন বোঝে? ছেলেরা কাঁদবে নাকি কাঁদবে না সেটা সে জানে? মেয়েরা হাতে চুড়ি পরে বসে থাকে নাকি পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ায়, তা বোঝে? বোঝে না। আমরাই তাদেরকে ছোটো থেকে একটু একটু করে নারীকে অসম্মান করতে শেখাই, অপমান করতে শেখাই। জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন আমরাই তাকে শেখাই! ছেলেটাকে ছেলেরা কাঁদে না- না শিখিয়ে শেখানো উচিত ছেলেরা কাঁদায় না।

হাসলে ব্যক্তিত্ব কমে যায়- না শিখিয়ে শেখানো উচিত, অন্যকে হাসাতে পারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ।

মেয়েদের মতো চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকচ- না বলে বলা উচিত, কাচের চুড়ি রিনিঝিনি করা হাতটাকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীটা জয় করো!

নিজেকে পালটাতে হবে। ছোটো ছোটো অভ্যেসগুলো পালটাতে হবে। ছেলেরা পুরুষ মানুষ না হয়ে মানুষ হতে শেখো। মেয়েরাও কেবলি মেয়ে না হয়ে হয়ে ওঠো সত্যিকারের মানুষ।

আজ থেকেই নিজেকে দিয়ে যদি এই ছোট্ট পরিবর্তনগুলো শুরু করতে পারি, বিশ বছর পর এই সমাজে পরিবর্তন আসবেই। আসতেই হবে! ■

# চালাক গাধা

আলম তালুকদার

অনেক আগের তো হবেই। তা কত হাজার বছর আগের কথা তা বলা হচ্ছে না। তবে ঐ কাকিলা মাছ চিনছেন তো। টাঙ্গাইলারা কাকালা মাছ বলে। সেই কাকিলা মাছেরা বড়ো বড়ো কুমির ধরে গিলে ফেলত, আর কি হতো জানো, ব্যাঙ আছে না ঐ ছোটো ব্যাঙেরা তখন হাতির মাহুত হতো এবং বাঘাইর মাছ ইয়া বড়ো মাছ সেসব মাছ মাছরাঙা পাখিরা ঠোঁটে করে অনায়াসে নিয়ে গাছের ডালে বসে মজা করে খেত। হু হু তাহলে ভাবো সে কত কাল আগের ঘটনা।

সেই সময়ের ঘটনা এখন তোমাদের বলব। হয়ত বিশ্বাস হবে না। না হলে কী হবে ঘটনাতো ঘটেছিল সেহেতু অনেকেই ঘটনাটা লিখেছে বলেছে, কাজেই আমিও আমার মতো করে লিখছি। সেই কালে অনেক বন ছিল। সব বিরাট বিরাট বন। তো ঐ রকম একটা বনের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা গাধা ঘাস খাচ্ছিল। সহজভাবে এত ঘন মোটা তাজা ঘাস পেয়ে গাধা মজা করে খেতে খেতে খুব নাদুস নুদুস হয়ে যায়। খুব মোটা তেলা তেলা চেহারা। দেখলেই চড়তে ইচ্ছে করে। সে ঘাস খায় আর বিশ্রাম করে।

হঠাৎ গাধা খেয়াল করল বনের মধ্যে ঘাস নড়াচড়া করছে। তার খুব রাগ হলো। গাধা খুব মুড নিয়ে কর্কশ গলায় বলল, এই ওখানে ঘাস নাড়ায় কে? কার এত বড়ো সাহস? একটু পরে দেখল একটা শেয়াল।

শেয়াল মাথা বের করে গাধাকে দেখে বললঃ, ও গাধা? ভালো তো? ভালো তো থাকবেই খুব যে খেয়ে বড়ো লোক হয়ে গেছ। এখন কী আর আমাদের চিনবে? আমি হলাম তোমাদের শিয়াল সাহেব। শিয়ালের কথা শুনে গাধা রাগে আরো পাগলা গাধা হয়ে গেল। রাগে কাট কাট। কথাও বলল কাট কাট।

ইসরে চুরি ছাড়া নাই কাম
তার আবার সাহেব নাম।

শিয়াল ছড়া শুনে বলল

দেখো গাধা হাঁদা
কথাটা কালো নয় সাদা।

জবাবে গাধা বলল,

তোমার কী ইতিহাস
দেখলে পরের মুরগি হাঁস
চুরি করে ধরে খাস
চোরা কি বলতে চাস?
দশবার তোর হবে ফাঁস।

শিয়াল কী আর ছাড়ে সেও জবাব দেয়

সত্যি তুমি গাধা
আমার যা বুদ্ধি আছে।
দুনিয়ার সাথে নাই তোমার পরিচয়
কীভাবে জানবে আমারটা চুরি নয়।

গাধা বলল,

রাতে তোমার যে কাম
ওটার তবে কী দিবে দাম?

শিয়াল খ্যাঁ খ্যাঁ হেসে বলল, এই তো বুঝলে না, মানুষেরা কী করে? পরের দেশ জোর করে দখল করে না? লুটপাট করে না, মানুষ মারে না? সেই যদি চুরি না হয় তাহলে বীর শিয়ালের তা চুরি হবে কেন? আমরা জোর করে ধরে এনে খাই। আমাদের খাবারের অধিকার আছে আবার বাঁচারও অধিকার আছে। এটা জন্মগত অধিকার।

আরে যতই দেখাও যুক্তি
চোর উপাধি হতে নাই শিয়ালের মুক্তি।

গাধা আবার ছড়া শুনালো। গাধার ছড়া আনমনে শুনে শিয়াল রেগে অন্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাধার উপর। খাবলা দিয়ে ধারালো নখ দিয়ে রক্তাক্ত করে দিয়ে শিয়াল বনে পালালো।

শিয়ালের এমন আচানক ব্যবহারে গাধা আরো গাধা হয়ে গেল। গাধা কসম কাটল। আমি যদি এর প্রতিশোধ না নিতে পারি তাহলে আমি গাধাই নই। তক্কে তক্কে গাধা দিন কাটায় রাত কাটায়।

একদিন না, একরাতের ঘটনা। গাধা তখন এক গেরস্তের বাড়িতে। শিয়াল গেছে ঐ গেরেস্তের বাড়িতে। সেদিন বাড়ির মালিক গাধার চালাকিতে জেগে ছিল। শিয়াল যেমনি খোয়ারের কাছে গেছে অমনি বাড়ির মালিক জাল মেরে শিয়ালকে আটকিয়ে ফেলেছে। শিয়াল তো ফাঁদে আটকা। এবার? এবার কী হবে রে শিয়াল? আছে তোর খেয়াল?

শিয়াল সাহায্য চেয়ে গাধাকে ডাকতে লাগল। কী বলে ডাকল? দাদা! দাদা!

সেই হতে শিয়াল আর গাধাকে গাধা না ডেকে দাদা ডাকে। ■

# কন্যা সুপার হিরো

জান্নাতে রোজী

এগিয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন, এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। যে এগিয়ে যাওয়ায় সমানভাবে অংশ নিচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়েই। নারী আজ আর কোনো গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, অবদান রেখে চলেছেন দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়। যাদের সুপার হিরো বলেও আখ্যায়িত করেছেন অনেকে। এরকম অসংখ্য সুপার হিরোর মধ্য থেকে দুইজন-একজন সুপার হিরো সম্পর্কে জেনে নেই চলো বন্ধুরা।

**আঁখি খাতুন:** বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ডিফেন্ডার ১৫ বছর বয়েসি আঁখি খেলছেন জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল দলে। সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল টুর্নামেন্টে সেরা হয়েছেন তিনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় বঙ্গমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং ম্যান অব দ্য মাচ নির্বাচিত হন। ফুটবলের পাশাপাশি অ্যাথলেটিক্সেও সমান পারদর্শী। সেজন্য দুইবার পুরস্কারও নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে। শাহজাদপুর উপজেলার পাড়কোলা গ্রামের দূরন্ত এ কিশোরী বর্তমানে বিকেএসপি'তে অধ্যয়নরত।

**সুরাইয়া:** দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সুরাইয়া এ বছর পিএইচডি করতে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ে। তাঁর পিএইচডির বিষয় প্রতিবন্ধিতা ও নারী। সুরাইয়া ২০১৫ সালে জাহঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হিসেবে দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন।

নীলফামারীর মেয়ে সুরাইয়া জন্মগতভাবে রেটিনার সমস্যায় আক্রান্ত। এইচএসসি পর্যন্ত নিজে লিখেই পরীক্ষা দিতে পেরেছেন। কিন্তু তারপর থেকেই তার চোখ ঝাপাস হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হিসেবে পড়াশোনার পাশাপাশি চলেছে সংসার। এছাড়া দেশে সুরাইয়া উইমেন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পিএইচডি শেষ করে পাঁচ বছর পর দেশে ফিরে প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি নিয়ে কাজ করবেন- এমনই ইচ্ছা তার। সমাজের, দেশের সুপার হিরো তো এরাই, তাই না! ■

## সম্ভাবনাময় পেশা

# অকুপেশনাল থেরাপি

রাবেয়া ফেরদৌস

অকুপেশনাল থেরাপি হচ্ছে এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতি, যা একজন রোগীর দৈনন্দিন বা ব্যক্তিগত কাজে তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্বনির্ভর করার জন্য কাজ করে থাকে। এছাড়াও একজন সুস্থ ব্যক্তি যাতে তার কাজে কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সে জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্ট পরিবেশগত কাঠামোর পরিবর্তন (Environmental modification)-এর কাজ করে থাকেন।

একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট রোগীর শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে এ কোর্সটি ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এটি একটি জনপ্রিয় পেশা যেখানে রয়েছে গ্রাজুয়েট শেষ করার সাথে সাথে চাকরি পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ।

এ কোর্সটি বিশ্বব্যাপী অকুপেশনাল থেরাপি পেশার সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান-এর WFOT (ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব অকুপেশনাল থেরাপি, www.wfot.com) দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তাই এ কোর্সটি সারাবিশ্বে সমান মান নিয়ন্ত্রণ করে। যার ফলে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে চাকরি ও উচ্চশিক্ষার অভাবনীয় সুযোগ। অকুপেশনাল থেরাপি কোর্সটি সম্পূর্ণ সেশনজট মুক্ত। ফলে লেখাপড়ায় দীর্ঘ সময় ব্যয়, অর্থ সাশ্রয়সহ বিভিন্ন প্রকার টেনশনমুক্ত থাকা যায়। সুতরাং স্মার্ট ক্যারিয়ার ও উজ্জ্বল ভবিষৎ ত্বরান্বিত করতে অকুপেশনাল থেরাপিতে গ্রাজুয়েশনের বিকল্প নাই।

### অকুপেশনাল থেরাপিস্টদের চাকুরির ক্ষেত্রসমূহ

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে দেশি ও বিদেশি অনেক এনজিও কাজ করে থাকে যেখানে অকুপেশনাল থেরাপিস্টদের কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল, বিশেষায়িত স্কুল এবং রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারগুলোতে এবং বাংলাদেশ ছাড়াও বহির্বিশ্বের অনেক দেশে কাজের ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ আছে।

### কীভাবে ভর্তি হবে

ঢাকার সাভারে অবস্থিত সিআরপিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার একাডেমিক ইনস্টিটিউট 'বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশন্স ইনস্টিটিউট (BHPI)' এ অকুপেশনাল থেরাপি কোর্সটি চালু রয়েছে। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় কর্তৃক অনুমোদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এবং চিকিৎসা অনুষদের অধীনে, একাডেমিক ৪ বছর ও বাধ্যতামূলক ১ বছর ইন্টার্নশীপসহ মোট ৫ বছর মেয়াদি কোর্স। ভর্তির জন্য জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৭.০০ এবং এসএসসি ও এইচএসসিতে পৃথক পৃথকভাবে জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলি জানার জন্য যোগাযোগ কর এই ঠিকানায়

অকুপেশনাল থেরাপি বিভাগ, বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশন্স ইনস্টিটিউট (বিএইচপিআই, সিআরপির একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান), চাপাইন, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩
ওয়েবসাইট: www.crp-bangladesh.org ■

# আমরা করব মঙ্গল জয়

রেজা নওফল হায়দার

থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখবো এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।

হাউই চড়ে যায় যেতে কে
চন্দ্রলোকের অচিনপুরে,
শুনবো আমি, ইঙ্গিত কোনো
মঙ্গল হতে আসছে উড়ে।

কাজী নজরুল ইসলামের সেই কালজয়ী কবিতাটি শত শত তারুণ্যের মনের ক্ষুধাকে স্বপ্নীল ভাষার আশ্রয়ে নিয়ে গেছেন এক কল্পনার রাজ্যে। যেখানে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আগামী। মানুষ এবার জয় করতে যাচ্ছে মঙ্গল গ্রহকে।

**মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অভিযান**

মঙ্গলের প্রথম ফ্লাই-বাই করতে সমর্থ হয় নাসার মেরিনার ৪। ১৯৬৪ সালে এই নভোযান উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। প্রথম মঙ্গলের ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে দুটি সোভিয়েত সন্ধানী যান, মার্স ২ এবং মার্স ৩। ১৯৭১ সালে উৎক্ষেপিত এই দুটি যানই সোভিয়েত মার্স প্রোব প্রোগ্রাম এর অংশ ছিল। দুঃখের বিষয় হলো, অবতরণের মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মাথায় দুটি নভোযানের সাথেই পৃথিবীর মিশন কন্ট্রোলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এরপর ১৯৭৬ সালে শুরু হয় নাসার বিখ্যাত ভাইকিং প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে দুটি অরবিটার এবং প্রতিটি অরবিটারের সাথে একটি করে ল্যান্ডার ছিল। দুটি ল্যান্ডারই ১৯৭৬ সালে মঙ্গলের ভূমিতে অবতরণ করে। ভাইকিং- ১ ছয় বছর এবং ভাইকিং- ২ তিন বছর কর্মক্ষম ছিল এবং তাদের সাথে এই সময়ে পৃথিবীর যোগাযোগও ছিল।

ভাইকিং ল্যান্ডারগুলোই প্রথম মঙ্গলের রঙিন ছবি রিলে করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিল। এগুলো মঙ্গলপৃষ্ঠের এত সুন্দর মানচিত্র প্রস্তুত করেছিল যে এখনো তার কোনো কোনোটি ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েত সন্ধানী যান ফোবোস ১ এবং ফোবোস ২, ১৯৮৮ সালে মঙ্গল এবং তার দুটি উপগ্রহ-ফোবোস ও ডিমোস পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। দুঃখজনকভাবে ফোবোস ১-এর সাথে যাত্রাপথেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফোবোস ২ মঙ্গল এবং ফোবোসের ছবি তোলার পর ফোবোসে অবতরণের উদ্দেশ্যে দুটি ল্যান্ডার নামাতে যাওয়ার ঠিক আগে অকেজো হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এর সাথেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৯২ সালে মার্স অবজারভার অরবিটার ব্যর্থ হওয়ার পর নাসা ১৯৯৬ সালে মার্স গ্লোবাল সারভেয়ার প্রেরণ করে। শেষের অভিযানটি ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। ২০০১ সালে এর প্রাথমিক মঙ্গল মানচিত্রায়ন কাজ সম্পন্ন হয়। ২০০৬ সালের নভেম্বরে তৃতীয় বিস্তৃত প্রোগ্রামের সময় এর সাথে যোগাযোগ

বিচ্ছিন্ন হয়। মহাকাশে প্রায় ১০ বছর কর্মক্ষম ছিল এই সারভেয়ার। সারভেয়ার প্রেরণের মাত্র এক মাস পরই নাসা মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মার্স পাথফাইন্ডার পাঠায় যার মধ্যে সোজার্নার নামক একটি রোবোটিক যান ছিল। সোজার্নার মঙ্গলের এরিস উপত্যকায় অবতরণ করে। এই অভিযান ছিল নাসার আরেকটি বড়ো ধরনের সাফল্য। এই অভিযানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মঙ্গলের চমৎকার সব ছবি পাঠানোর জন্য জনমনে এ নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছিল।

**মঙ্গলের লাল মাটির রহস্য খুঁজছে ইনসাইট**

মাত্র ৭টা মিনিট তখন মনে হচ্ছিল অনন্তকাল। ২২ কোটি কিলোমিটার দূরের লাল গ্রহতে কি হয়েছে সেটার সিগন্যাল পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে সময় নিবে ৭ মিনিট। গ্রিনিচ সময় ৭টা ৫৩ মিনিট, নাসার কন্ট্রোল রুমে এক উল্লাসের ঝড় বয়ে গেল। ৬ মাস আগে শুরু হওয়া বুক কাঁপুনিটার সমাপ্তি। মাটি স্পর্শ করেছে রোবট ইনসাইট। প্রতিবেশীকে নিয়ে জানার আগ্রহ মানবজাতির জন্মগত। কাছের প্রতিবেশী চাঁদের ঘরে বেড়িয়ে আসা শেষ। চোখ এবার মঙ্গলের দিকে। মঙ্গল নিয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই। ১৯শে সেপ্টেম্বর ঝড়ের কবলে পড়ে স্তব্ধ হয়ে যায় মঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো নাসার রোবট কিউরিসিটি। তবে উৎসাহী মানুষের হাহুতাশ করার কারণ নেই কারণ ২ মাসের মধ্যেই এসে হাজির হয়েছে ইনসাইট।

ইনসাইটের নির্মাণ শুরু হয় ৭ বছর আগে। এক প্রতিযোগিতায় ২৮টি অভিযান পরিকল্পনা থেকে নিজের দিকে দৃষ্টি কাড়ে ইনসাইট। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা নাসার তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু করেন। ২০১৪ সালে রোবটটি মঙ্গলে অবতরণের জন্য ল্যান্ডার (ল্যান্ডার জাতীয় যানগুলো ধীর গতিতে কোনো গ্রহের পৃষ্ঠে অবতরণ করে) নির্মাণ শুরু করে মার্কিন প্রতিষ্ঠান লকহিড মারটিন। সবমিলে ৪২৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়। যদিও পরে মোট খরচ ৮৩০ মিলিয়নে এসে দাঁড়ায়। ২০১৬ সালে উৎক্ষেপণের কথা থাকলেও টেস্টে কিছু ভুল পাওয়া যায়। ২০১৭ সালের নভেম্বরে আবার ল্যাবরেটরিতে কৃত্তিমভাবে মঙ্গলের পরিবেশ তৈরি করে পরীক্ষা করা হয় ইনসাইটকে।

৫ই মে, ২০১৮। ভ্যান্ডারবার্গ বিমান ঘাঁটি থেকে অ্যাটলাস-৫ রকেটে চেপে লাল গ্রহের দিকে রওনা দেয় ইনসাইট। ৪৮৫ মিলিয়ন কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে তারপর সফলভাবে মঙ্গল গ্রহের ইলিশিয়াম পানিশিয়া নামক স্থানে সফলভাবে অবতরণ করে। জায়গাটি আগের মঙ্গলযান কিউরিসিটির বর্তমান অবস্থান থেকে ৬০০ কিলোমিটার উত্তরে। এই স্থানে সূর্যের আলো বেশি পড়ে বলে ইনসাইটকে এখানে অবতরণ করানো হয়। ইনসাইটের শক্তির মূল উৎস সূর্যের আলো। ৭ ফুটের ব্যাসের দুইটি পাখা দিয়ে সূর্যশক্তি সংগ্রহ করবে রোবটটি। ইনসাইটের ভাঁজ

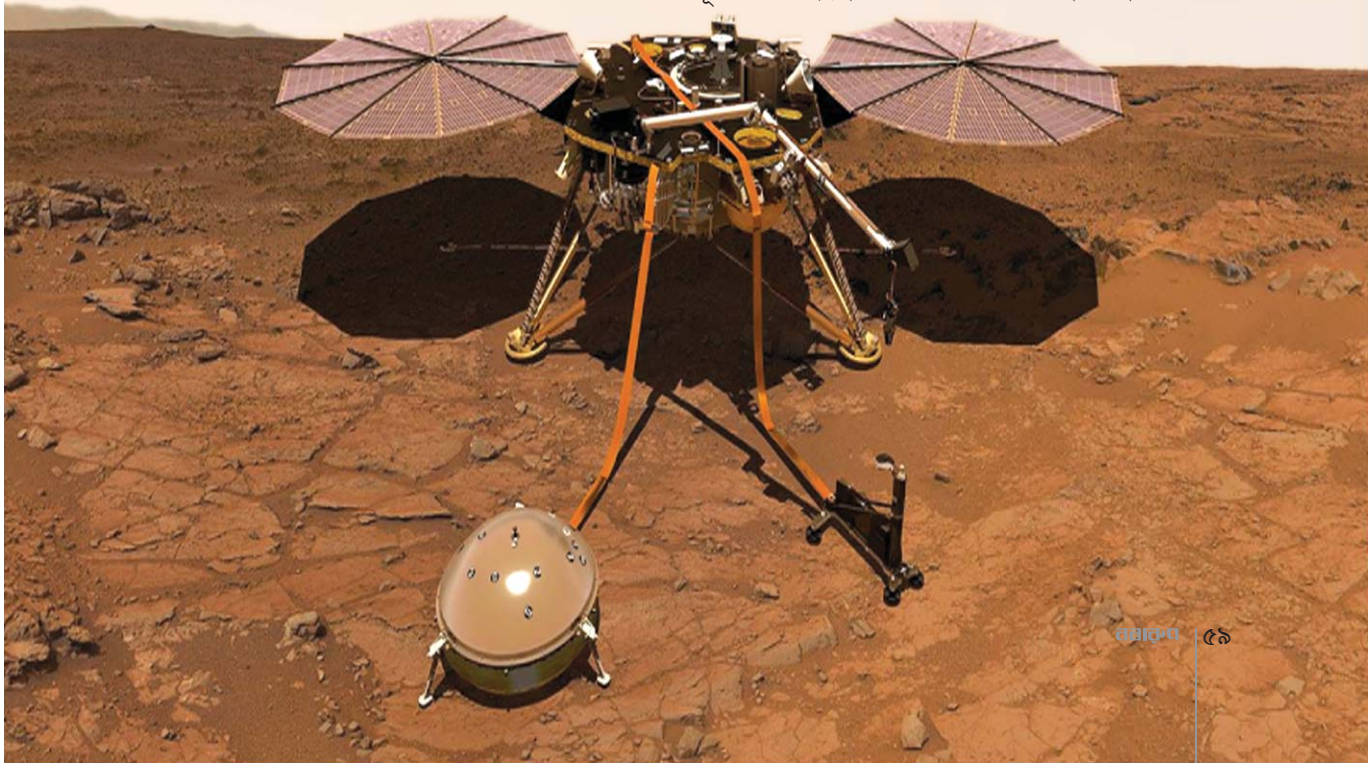

হয়ে থাকা সোলার প্যানেল ঠিক মতো খুলেছে কিনা গবেষকদের ভয় এখানেও ছিল। সোলার প্যানেল না খুললে পুরো অভিযানটিই মাটি হতো।

ইনসাইটের সাথে মঙ্গলের কক্ষপথে মার্কো এ এবং মার্কো বি নামের দুটি স্যুটকেস আকারের ক্ষুদ্র স্যাটেলাইট স্থাপন করা হয়েছে। এই স্যাটেলাইট স্থাপনও নাসার বিরাট এক কৃতিত্ব। কারণ এই প্রথম গভীর মহাকাশ থেকে প্রথম ছবি পাঠাল কোনো কিউবস্যাট। ১৩ কেজি ওজনের এই দুইটি স্যাটেলাইটের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে ইনসাইটের সাথে।

ফ্রান্স এবং সুইসদের ডিজাইন করা Seismic Experiment for Interior Structure মঙ্গল গ্রহের ভূকম্পন এবং অভ্যন্তরীণ আচরণ বিশ্লেষণ করে তথ্য পাঠাবে। অতিমাত্রায় সংবেদনশীল বলে একে শক্ত খোলস দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়েছে। ভূতরঙ্গের দিক এবং উৎস থেকে ইনসাইট বোঝার চেষ্টা করবে মঙ্গল গর্ভে কি খনিজ উপাদান আছে। বায়ুমণ্ডল নিয়েও গবেষণা করবে এই যন্ত্রটি।

ইনসাইটের সবচেয়ে চমকপ্রদ যন্ত্র হলো ১৬ফুট একটি প্রোব। জার্মানদের বানানো এই যন্ত্রটি মঙ্গল পৃষ্ঠে ১৬ফুট গর্ত খুঁড়তে পারবে এবং মাটির নমুনা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করতে পারবে। মাটিতে তেজস্ক্রিয়তা, পানির অস্তিত্ব এবং কি কি মৌল আছে সেসব হয়তো জানাবে এই যন্ত্রটি। ১৬ফুট প্রোবের শেষভাগে একটি তাপমাত্রা শনাক্তকরণ সেন্সর সংযুক্ত আছে যা ভূগর্ভের তাপমাত্রার খবর জানান দিবে। লাল পাথরের গভীরে এখনো পানিকে উষ্ণ করতে পারার মতো তাপমাত্রা আছে কিনা জানাবে ইনসাইট। তরল পানিই বসতি স্থাপনের প্রধান বিবেচ্য বিষয়, তাই না?

মঙ্গলের প্রতিদিনের আবহাওয়া বিশ্লেষণ করতে ইনসাইটের সাথে আছে স্পেন থেকে বানিয়ে আনা সেন্সর। ২.৪ মিটার লম্বা রোবোটিক হাত ছোট পাথর খণ্ড বা মাটির নমুনা তুলে আনতে পারবে। এই হাতের সাথেও জুড়ে দেয়া হয়েছে ছোটো ক্যামেরা।

ইনসাইটের মূল ক্যামেরা হিসেবে আছে নাসার ডিজাইন করা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন আইডিসি ক্যামেরা। ১০২৪ x ১০২৪ রেজোলুশনে ৪৫ ডিগ্রি দেখতে পায় এই ক্যামেরা। এছাড়াও ১২০ ডিগ্রি দেখতে পায় এমন একটি দ্বিতীয় ক্যামেরা সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ক্যামেরাটি প্যানোরোমা ছবি তোলার জন্য ব্যাবহার হবে।

ইনসাইটের আরেকটি মজার দিক হলো এই রোবটটি ২টি চিপে ২.৪ মিলিয়ন মানুষের নাম নিয়ে মঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনলাইন মাধ্যমে যে কেউ তার নাম ইনসাইটে পাঠানোর জন্য জমা দিতে পারতো। বিজ্ঞান নিয়ে মানুষকে আরো উৎসাহি করে তুলতেই নাসার এমন পরিকল্পনা।

২০৩০ সাল নাগাদ মানুষ মঙ্গলে গিয়ে বসবাস করার পরিকল্পনা করছে। সেই পরিকল্পনাকে এক দু পা করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইনসাইট। মানুষের হাতে থাকা বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে হয়তো মঙ্গলে বসবাস করাটা উচ্চাভিলাষ মনে হতে পারে। তবে উচ্চাভিলাষ থেকেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি।

**মঙ্গলযাত্রা নিয়ে ইলন মাস্কের উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা প্রকাশঃ** একটা লম্বা সময় অপেক্ষা করার পর অবশেষে স্পেসএক্স (Space X) এর প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক মেক্সিকো আন্তর্জাতিক এস্ট্রোনমিক্যাল কংগ্রেসে (IAC) মঙ্গলে মানুষের উপনিবেশ স্থাপনে তাঁর যে পরিকল্পনা তা প্রকাশ করেন। আর ইলন মাস্কের এই প্রস্তাবকে আন্তঃগ্রহ পরিসেবা পদ্ধতি (ITS) নামে নামকরণ করা হয়। এই প্রকল্প একই সময়ে একসাথে ১০০ জন মানুষ বহন করে লাল গ্রহটির পৃষ্ঠে পাঠাতে পারবে। একটি দৈত্যাকার রকেটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে কাজটি। আর এরই সাথে রকেটটি নাসার সবচেয়ে বড়ো রকেট Saturn V -র আকারকে পেছনে ফেলে ইতিহাস তৈরি করবে। ইলন মাস্ক তাঁর উপস্থাপনায় বলেন, 'আমি মঙ্গলে গমন সারা জীবনের জন্য সহজতর সম্ভব করতে চাই। যেন যে কেউ চাইলেই সেখানে যেতে পারে।' নামহীন এই রকেটটি (বর্তমানে 'মঙ্গল যান' নামে ডাকা হচ্ছে) দেখতে অসাধারণ ও চিত্তাকর্ষক। সবার উপরে মহাকাশযানটিকে একইসাথে মানুষ অথবা কার্গো বহন করার মতো করে বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। নিচের অংশে রকেটটিকে মহাকাশের কক্ষপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পেসএক্সের নতুন ইঞ্জিন মিথেন জ্বালানি ব্যবহারযোগ্য রেপটর রাখা হয়েছে। যা রকেটিকে কক্ষপথে রেখে এসে পুনরায় উৎক্ষেপণ

করার জন্য কেপ কেনাভেরাল, ফ্লোরিডার উৎক্ষেপণ স্থানে নিরাপদে ফিরে আসবে। মঙ্গলে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য মানুষ নিয়ে একটি রকেট উৎক্ষেপণ করার পর আরেকটি রকেট জ্বালানি নিয়ে কক্ষপথের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। পরবর্তী যানটি পূর্বের যানের সাথে মিলিত হয়ে মিথেন ভিত্তিক জ্বালানি সরবরাহ করে দেবে এবং মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাত্রা পুনরায় শুরু করবে। ইলন মাস্ক বলেন, প্রথম যানটিকে 'হার্ট অব গোল্ড' নামে ডাকা হবে। এটা শুনতে অনেকটা কল্পকাহিনির মতো হলেও, ইলন মাস্ক তার স্বভাব সূলভ চরিত্রের মাধ্যমেই আজ থেকে ১০ বছর পরের প্রথম যাত্রার অবতরণের জন্য এক অতিশয় আশাবাদী টাইমলাইন দিলেন। যা আনুমানিক ২০২৬ এর কাছাকাছি কিংবা তারও আগে ২০২৪-এর মধ্যে শুরু করা হবে। তিনি ইঙ্গিত করেন যে, সে মঙ্গলকে পরিবর্তন করে এতে মহাকাশ পোশাক ছাড়াই মানুষের বসবাস উপযোগী করতে চান। যদিও সে এই কাজ কিভাবে করবেন তার বিস্তারিত পরিকল্পনার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেননি। উপরন্তু তিনি একজন শিল্পীর মতো করে মঙ্গল রূপান্তরের কাহিনি উপস্থাপন করে গেলেন। এই অগ্রগতির জন্য স্পেসএক্স ২০১৮ সাল থেকে পৃথিবী এবং মঙ্গল যখন অনুকূল দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করবে তখন থেকে মঙ্গল অভিযান শুরু করবে। এটা প্রতি ২৬ মাস পর পর পৃথিবী ও মঙ্গল একবার কাছাকাছি অবস্থানে আসে সুবিধাজনক উড্ডয়নের জন্য। এই মুহূর্তে স্পেসএক্সের মোট কর্মীর পাঁচ ভাগ এই ITS প্রকল্পে কাজ করে যাচ্ছেন। ৪০ থেকে ১০০ বছরের মাধ্যে কমপক্ষে ১০ লক্ষ মানুষকে আনুমানিক ১০ হাজার ট্রিপের মাধ্যমে মঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার আশা করছেন তিনি। ইলন মাস্ক জানান মঙ্গল যাত্রাকে (পাঁচ মাসের ভ্রমণ) আরামদায়ক ও মজাদার করতে মহাকাশযানটিতে জিরো-জি গেম এবং রেস্টুরেন্টসহ অন্যান্য অনেক ব্যবস্থা রাখা হবে। মাস্ক বলেন, 'এবং দিনশেষে মঙ্গল থেকে কেউ যদি ফিরে আসতে চায় সে দিক চিন্তা করে মঙ্গল যানটিকে ফিরে আসার মতো করেও ডিজাইন করা হয়েছে। মঙ্গল কোনো ধোঁকাবাজির খেলা নয়।' এটা অতিশয় আশাবাদী বলে মনে হতে পারে এবং এটা যে তাই সে ব্যাপারে

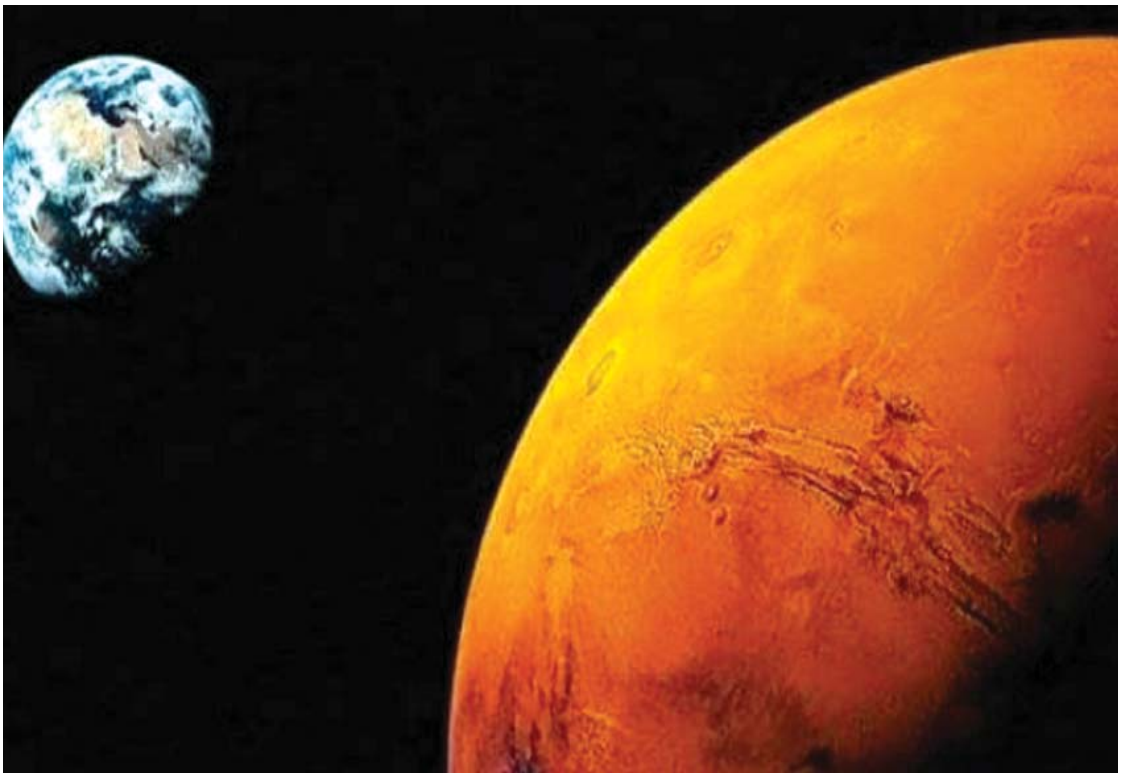

কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইলন মাস্ক যে কাজটা সম্পন্ন করতে কতটা তৎপর তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। এই প্রকল্পে যতটা সম্ভব তিনি নিজের অর্থই বিনিয়োগ করছেন। তিনি বলেন, 'সম্পদ জমানোর চেয়ে আমি বিভিন্ন গ্রহে বসবাসের জন্য বড়ো অবদান রাখার সুযোগটাকেই আমি বড়ো করে দেখি।'

আর এটাই একটা বড়ো প্রশ্নের আংশিক উত্তর হয়ে গিয়েছে। কেন একটা মৃত গ্রহকে নিয়ে এত উৎসাহ? সেখানে আমরা মহাকাশ পোশাক বা ইতিবাচক অবকাঠামো ছাড়া বসবাস করতে পারব না। তাহলে কেন আমরা সেখানে যেতে চাচ্ছি? উত্তরটা ইলন মাস্ক খুব সহজ ভাবেই দিলেন। মানুষ এক পর্যায়ে রোজ কিয়ামতের মুখোমুখি হবে, গ্রহাণুর প্রভাব কিংবা অন্য কোনো সভ্যতার শেষ দৃশ্য মঞ্চায়িত হবে। যদি আমরা অন্য কোনো গ্রহে বা বিশ্বে বসবাস না করি তবে আমরা বেশ মাতাল রয়েছি।' এসব বিষয় মাথায় রেখে ইলন মাস্ক মঙ্গল যাত্রা থামিয়ে রাখবেন না। তিনি ITS এর মাধ্যমে শনির চাঁদ ইনছেলাডাস, বৃহস্পতির চাঁদ ইরোপাসহ অন্যান্য সব জায়গায় ভ্রমণের ব্যবস্থা সচল রাখতে পারবেন। এটা কী প্রশংসনীয় কাজ, হ্যাঁ, এটা একটা লম্বা বিতর্কের বিষয়। রেপটর ইঞ্জিনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনে মাস্ক অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে। এই ইঞ্জিনগুলো অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে রকেটকে শক্তি প্রদান করা হবে এবং বিশাল বিশাল জ্বালানি ট্যাংক মহাকাশযানে নিজে নিজে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এজন্য অনেক বাধা পেরুতে হবে এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। মঙ্গলে কিভাবে উপনিবেশগুলি টিকে থাকবে? কে যাবে ঐ গ্রহে। বিকিরণের সাথে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবে (মাস্ক বলেন, এটা কোনো বড়ো সমস্যা হবে না), এই প্রশ্নগুলি আগামী কয়েক দিন, মাস কিংবা বছরব্যাপী সময় নিয়ে বিবেচনার কেন্দ্রে থাকবে।

এখনকার জন্য মাস্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে অনুপ্রাণিত করা যাতে তাঁরা তার পরিকল্পনার সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। সে সহযোগিতা চাচ্ছেন, সাহায্য চাচ্ছেন। এটাকেই তার জন্য একটি অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'প্রথম যাত্রাটি খুবই বিপদজনক হবে। মৃত্যুর ঝুঁকি প্রবল। আরোহীকে অবশ্যই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে হবে।' কিন্তু এ সকল আলোচনার ভিড়ে মাস্ক-এর এই পরিকল্পনা মিডিয়ার ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। স্পেসএক্স দেখিয়ে দিয়েছে ২০০২ সালে বলার মতো কিছু নানিয়ে শুরু করে আজকে বিশ্বের অন্যতম নেতৃস্থানীয় একটি উড্ডয়ন পরিচালক হিসেবে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছেছে এটাকেই মাস্ক সবার সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি কী সত্যিই মঙ্গলে একটি শক্তিশালী উপনিবেশ শুরু করতে পারবেন? সেটা সময়ই বলে দেবে।

**মঙ্গলে বাস করতে চান মাস্ক**

মঙ্গলগ্রহে বাস করতে নিজের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন স্পেসএক্স প্রধান ইলন মাস্ক। এইচবিও'র এক সাক্ষাৎকারে মাস্ক বলেন, '৭০ শতাংশ' সম্ভাবনা আছে যে তিনি মঙ্গলগ্রহে যাবেন। শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নয় সেখানে বাস করবেন তিনি। খবর প্রযুক্তি সাইট সিনেটের। সাক্ষাৎকারে মাস্ক বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে আমরা বেশ কিছু যুগান্তকারী কাজ করেছি। আমি এগুলো নিয়ে বেশ আনন্দিত। আমি একেবারে সেখানে চলে যাওয়ার কথা বলছি।' গ্রাহককে মহাকাশ ভ্রমণে নিতে স্টারশিপ নামে একটি মহাকাশযান বানিয়েছে স্পেসএক্স। এই মহাকাশযানটিতে করে চাঁদসহ বিভিন্ন গ্রহে ভ্রমণে নিয়ে যাবে মাস্কের প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু সেজন্য গ্রাহককে মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হবে। মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে মাস্ককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'মঙ্গলগ্রহে মৃত্যুর সম্ভাবনা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি।' 'সেখানে মারা যাওয়ার খুব ভালো সম্ভাবনা আছে, সামান্য একটু এগোলেই গভীর মহাকাশে চলে যেতে পারেন। (মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে)' মাস্ক আরো বলেন, এমনকি আপনি যদি সেখানে নিরাপদে পৌঁছান মঙ্গলগ্রহে বসতি বানাতে আপনাকে 'বিরতিহীনভাবে কাজ করে যেতে হবে। আপনাকে স্টারশিপের বাইরেও থাকতে হতে পারে।' ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরেননি মাস্ক। তিনি বলেন, 'অনেক মানুষ আছেন যারা পর্বতারোহী। মাউন্ট এভারেস্টে প্রায়ই মানুষ মারা যান। তারা চ্যালেঞ্জের জন্য কাজটি করতে পছন্দ করেন।' ■

# একটি স্বপ্ন

## হাসানাত লোকমান

একটি স্বপ্ন বেঘোর ঘুমে
একটি স্বপ্ন ভাঙায়,
একটি স্বপ্ন হৃদয় ভাঙে
একটি স্বপ্ন রাঙায়।
একটি স্বপ্ন তাল-বেতালে
একটি স্বপ্ন উড়ে,
একটি স্বপ্ন ব্যথা নিয়ে
সংগোপনে পুড়ে।
একটি স্বপ্ন ভোরের আলোয়
একটি স্বপ্ন দুপুরে
একটি স্বপ্ন নিরিবিলি
সাঁতার কাটে পুকুরে।
একটি স্বপ্ন ক্ষেত-খামারে
একটি স্বপ্ন ধানে,
একটি স্বপ্ন দেশে দেশে
মানবতার গানে।
একটি স্বপ্ন উজান গাঙে
একটি স্বপ্ন নায়ে,
একটি স্বপ্ন মায়ের খোঁজে
হাঁটে গাঁয়ে গাঁয়ে।

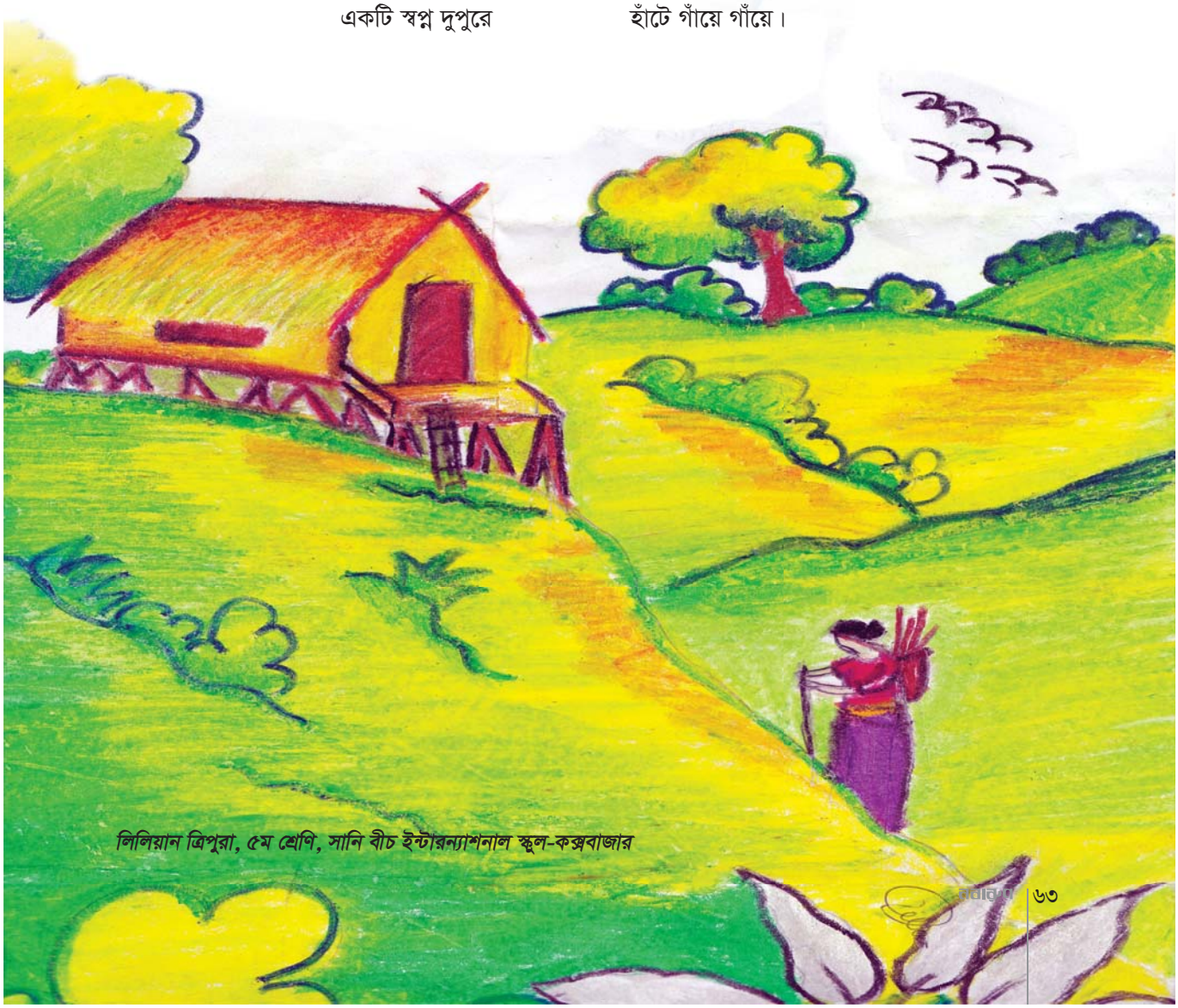

*লিলিয়ান ত্রিপুরা, ৫ম শ্রেণি, সানি বীচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-কক্সবাজার*

# মানুষ এখানে কথা কয় শিস্ দিয়ে!

মেজবাউল হক

বিশ্বের নানান দেশের মানুষ নানান ভাষায় কথা বলেন। শহরের মানুষের পাশাপাশি গ্রামের মানুষেরাও ভাষার আদান-প্রদান করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। বন্ধুরা, বিশ্বে এমন গ্রামও রয়েছে যেখানে সবাই কথা বলে শিস দিয়ে, পাখির মতো কিচির-মিচির করে। আজব মনে হলেও সত্যি। তেমনি একটি জায়গা হলো তুরস্কের গিরেসান প্রদেশের কানাকি জেলার কুসকয় গ্রাম। এ গ্রামের মানুষেরা পাখির মতো আওয়াজ করে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করেন।

এই এলাকার ১০ হাজার মানুষ এমন উপায়ে ভাষার বিনিময় করেন। উচ্চ তরাই অঞ্চলে পাহাড়ের আড়ালে একে-অন্যকে না দেখেই শিস দিয়ে ভাব প্রকাশ করে এখানকার মানুষ। বলা হচ্ছে, প্রায় ৫০০ বছর ধরে এভাবে কথা বলছেন এই জাতি। এই গ্রামে কথা বলার কোনো ভাষা নেই।

উত্তর তুরস্কের এই গ্রামের ভাষা প্রকাশ ইতিমধ্যে ইউনেস্কোর হেরিটেড তালিকায় স্থান পেয়েছে। এই ভাবে ভাষার আদান-প্রদানকে 'বার্ড ল্যাঙ্গোয়েজ' নামে দিয়েছে ইউনেস্কো। ইতোমধ্যে বিলুপ্তপ্রায় এই ঐতিহ্যকে বাঁচাতে উদ্যোগ নিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। তবে গত ৫০ বছরে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষা বা ভাব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তবে প্রযুক্তির ফাঁদ যেমন রয়েছে, তেমনই আগে যারা শিস দিয়ে ভাব প্রকাশ করতেন, সেই প্রজন্ম বুড়িয়ে গিয়েছে। তাদের জিহ্বা, আঙুল, দাঁতের জোর কমে গিয়েছে। যার ফলে এই অদ্ভুত ভাবের ব্যবহার বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

এ গ্রামের প্রধান মুহতার বলেন, প্রযুক্তি থাবা বসালেও আমরা আমাদের ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছি। গ্রামের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ এখনো শিস দিয়ে ভাব প্রকাশ করেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিস দেওয়া ভাষার ব্যবহার বিভিন্ন সময়ে স্পেন, মেক্সিকো ও গ্রিসে দেখা গিয়েছে। তবে তুরস্কে যেটা চলছে তা গুনমানে অনেক উন্নত। ৪০০টির বেশি শব্দ বা বাক্যবন্ধনী রয়েছে এতে। স্থানীয় স্কুলে এর শিক্ষাদান দেওয়া হচ্ছে, যাতে এটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ■

# শীতে শরীর চাঙা রাখে যে খাবার

## মো. জামাল উদ্দিন

এমন কিছু খাবার আছে যা শরীরের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে ছোটো-বড়ো নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়। তাপমাত্রা কমতে থাকলে আমাদের হজম শক্তি কমে যেতে শুরু করে। সেই সঙ্গে দেহের ভিতরের তাপমাত্রাও কমতে থাকে। তাই তো নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। এমন পরিস্থিতিতে বিশেষ কিছু খাবারই পারে শরীরকে চাঙ্গা রাখতে।

- তিলপাট্রি: তিল এবং গুড় দিয়ে বানানো মচমচে মিষ্টি জাতীয় এই খাবারটি শীতকালে শরীরকে চাঙ্গা রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আসলে এক্ষেত্রে গুড় একদিকে যেমন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে, তেমনি অন্যদিকে তিল দেহের ভিতরে তাপামাত্রা যাতে না কমে, সেদিকে খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, রক্তসল্পতার মতো রোগের চিকিৎসাতে গুড় এবং তিল বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- লাড্ডু: খেজুর গাছের রস, ময়দা, চিনি, ঘি, বাদাম এবং এলাচ দিয়ে বানানো লাড্ডু যদি সারা শীতকাল জুড়ে খাওয়া যায়, তাহলে রোগ ভোগের আশঙ্কা একেবারে কমে যায়। কারণ, গাছ থেকে সংগ্রহ করা রস শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে বাড়িয়ে দেয়। আর বাকি উপাদাগুলো শরীরকে রোগমুক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- কমলা লেবু: ভিটামিন সি এবং ভিটামিন এ রয়েছে এমন ধরনের ফল শীতকালে বেশি মাত্রায় খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ এই দুটি উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর একবার ইমিউনিটি বেড়ে গেলে কোনো ধরনের রোগই ধারে কাছে ঘেঁষার সুযোগ পায় না।
- গাজর: শীতকালে সর্দিকাশির সংক্রামণের খপ্পর থেকে বাঁচতে চাইলে তোমরা নিয়মিত গাজর খাবে। কারণ কমলা লেবুর মতো এই সবজিটিও ভিটানি সি-এ ঠাসা। ফলে প্রতিদিনের খাবারের সাথে গাজর থাকলে রোগ ভোগের আশঙ্কা তো কমেই সেই সঙ্গে শরীরও ভিতর থেকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।
- তিসির বীজ: পরিমাণ মতো তিসির বীজ নিয়ে হালকা ভেজে নিতে হবে। তারপর তাতে অল্প করে গুড়, বাদাম এবং পেঁপের বীজ দিয়ে এক সঙ্গে মিশিয়ে নাও। এই পদটি যদি সারা শীতকাল জুড়ে খেতে পারো, তাহলে শরীর নিয়ে আর কোনো চিন্তাই থাকবে না। কারণ যে যে উপাদাগুলো এখানে ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলো প্রতিটিই শরীর বান্ধব। শুধু তাই নয়, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের ঘাটতি মেটাতেও তিসির বীজ দিয়ে বানানো এই পদটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- সবজির সঙ্গে ডিম: প্রতিদিন একটা করে ডিমের অমলেট, পছন্দের যে-কোনো সবজির সঙ্গে খেতে পারো। তাহলে একদিকে যেমন প্রোটিনের ঘাটতি মিটিয়ে শরীরে শক্তি বাড়াবে, তেমনি অন্যদিকে পেট ভরে সবজি খাওয়ার কারণে শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেটের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ফলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে শরীরকে নিয়ে আর কোনো চিন্তাই থাকবে না। ■

# বুদ্ধিতে ধার দাও

## নাদিম মজিদ

### এ মাসের শব্দ ধাঁধা

পাশাপাশি: ১. সার্কভুক্ত একটি দেশ, ৩. পরিবর্তন, হৃদয়,৭. দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ, ১০. লেখার উপকরণ, ৮.এক ধরনের জলযান, ১২. আরবি মাস

উপর-নিচ: ১.শাখামৃগ, ২. মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ৪. বাকি, ৫.খনিজ, ৬. মস্তিষ্ক, ৯.সহস্র, ১১. কলমের মুখ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ১ | | | | | ■ | ২ |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ৩ | | ৪ | | | ■ | |
| ৫ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ৬ | |
| ৭ | | | | ■ | ■ | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ৮ | ৯ | | ■ |
| ১০ | | | ■ | ■ | | ■ | ১১ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ১২ | | |

### এ মাসের ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | * | | - | ৬ | = | |
| + | ■ | * | ■ | * | ■ | + |
| | / | ২ | * | | = | ৪ |
| - | ■ | + | ■ | - | ■ | - |
| ৪ | * | | - | ৫ | = | |
| = | ■ | = | ■ | = | ■ | = |
| | - | ৭ | - | | = | ১ |

**গত সংখ্যার শব্দ ধাঁধার সমাধান:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব | ■ | আ | ■ | ■ | ■ | প | ■ |
| লা | ■ | ম | য়় | না | ম | তি | ■ |
| কা | ন | ন | ■ | ■ | ন | ■ | ■ |
| ■ | ড়া | ■ | আ | ত্ম | গ | রি | মা |
| ■ | হ্য | ■ | ম | ■ | ড়া | ■ | প |
| ব | ল | ■ | ন্ত্র | ■ | ■ | ঢা | কা |
| র় | ■ | ■ | ণ | ■ | ■ | ■ | ঠি |
| ফ | তু | র | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

**গত সংখ্যার ব্রেইন ইকুয়েশনের সমাধান:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪ | / | ১ | + | ২ | = | ৬ |
| * | ■ | * | ■ | + | ■ | + |
| ২ | * | ৩ | - | ১ | = | ৫ |
| - | ■ | + | ■ | + | ■ | - |
| ৫ | + | ১ | - | ২ | = | ৪ |
| = | ■ | = | ■ | = | ■ | = |
| ৩ | * | ৪ | - | ৫ | = | ৭ |

# সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

# Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

# অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
**সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)**
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-43, No- 7, January 2019, Tk-20.00

*তাজনিন দেলওয়ার খান, নবম শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ*

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা